বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্বভারতী

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫৭ ॥

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী

৭৯. ভারত ও মধ্য এশিয়া

৮০. ভারত ও ইন্দোচীন

৮১. ভারত ও চীন

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

৮২. বৈদিক দেবতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৩. বঙ্গসাহিত্যে নারী

৮৪. সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

৮৫. বাংলার স্ত্রীশিক্ষা

ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৬. গণিতের রাজ্য

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষাগ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধনের এই কর্তব্য পালনে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ হইতে ১৩৫৬ সালে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ৭৮ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১ মাঘ ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৫১
সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৫৭

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ লিঃ, পি ১৬ গণেশচন্দ্র অ্যাভিন্যু, কলিকাতা
৩·২+২·১

বাংলার সর্বত্যাগী বিজ্ঞানতপস্বী

পরমভক্তিভাজন গুরুদেব

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গিত হল।

সূচী

ভূমিকা

জনসমাজে বিজ্ঞানের কথা বাংলায় প্রচার করতে হ'লে তার ভাষা এবং প্রকাশ হবে কিরূপ তার পথ আমাদের দেখিয়েছেন কবি তাঁর 'বিশ্বপরিচয়ে'। এমন সরল, সুন্দর, সরস এবং মনোজ্ঞ, অথচ নিখুঁত ক'রে যে তিনি বিজ্ঞানের তথ্যগুলি বর্ণনা করেছেন, তার তুলনা শুধু বাংলায় কেন পৃথিবীর অন্য কোন ভাষাতেও বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না। বর্তমান রচনায় আমি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করেছি।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণের অনেক ভুল ধারণা আছে। একদল আছেন যাঁরা বিজ্ঞানের জয়জয়কার করেন—এঁরা সংখ্যায় ভারী। কারণ তাঁরা বিজ্ঞানের প্রসাদে রেল স্টীমার মোটরকারে চড়ে বেড়ান, এরোপ্লেনে আকাশে ওড়েন, সিনেমাতে টকি দেখেন, টেলিফোনে কথা বলেন, রেডিওতে দেশবিদেশের গান বাজনা ও খবর শোনেন ; তার উপর বিজ্ঞান তাঁদের দেহমনের তুষ্টি সাধন করছে বিলাস ও আরামের কত রকমারি উপকরণ দিয়ে। তাঁদের রোগের সময় বিজ্ঞান আসছে ঔষধ নিয়ে, গ্রীষ্মের ক্লান্তির সময় বিজ্ঞান দিচ্ছে পাখার হাওয়া এবং অন্ধকারে জ্বালিয়ে তুলছে বিজলিবাতি।

আবার অন্য একদল আছেন যাঁরা বর্তমান সময়ে মানুষের সমস্ত দুঃখদুর্দশার জন্য বিজ্ঞানকে করেছেন অপরাধী—এঁরা সংখ্যায় লঘু। এঁদের মতে, বিজ্ঞান তার যন্ত্রপাতি কলকারখানা নিয়ে যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে তাতে মানুষের মন গেছে যন্ত্রের চাপে পিষ্ট হয়ে। মানুষ হয়েছে যন্ত্রের ক্রীতদাস। এই বেনে সভ্যতায় মানুষের বেড়ে উঠেছে অর্থের লোভ, স্বার্থের প্রসার এবং ক্ষমতার অহংকার। মুষ্টিমেয় লোকের ফেঁপে উঠছে ব্যাঙ্কের খাতায় জমার অঙ্ক, তথাপি অন্নবস্ত্রের অভাবে লক্ষ লক্ষ নরনারী করছে হাহাকার। মিথ্যার চাপে সত্যের হচ্ছে

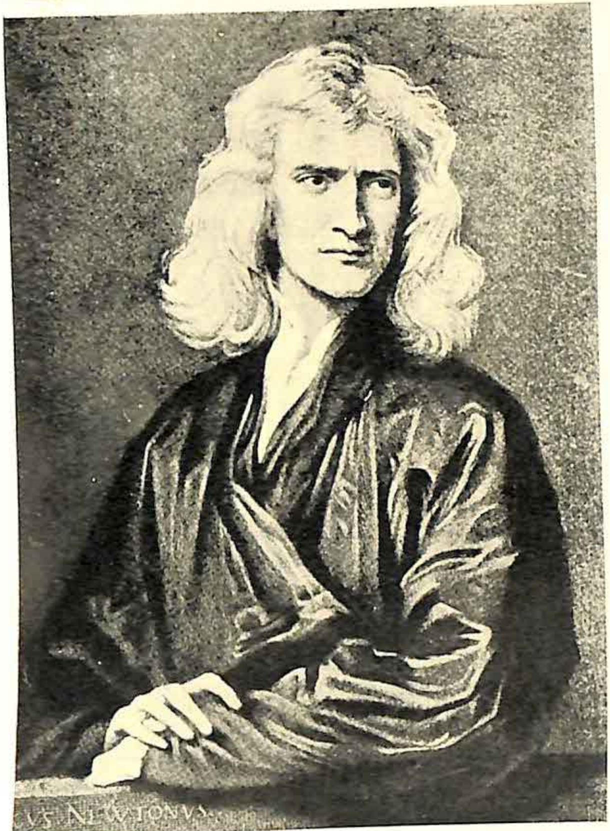
অপঘাত, জাতীয়তার ছদ্মবেশে নৃত্য করছে হিংসাদ্বেষ এবং দুর্বলের উৎপীড়নে বিদ্রূপ করছে স্বার্থোদ্ধত অবিচার। একদিকে জগৎ জুড়ে শ্রমিকদল খাটছে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, আবার অন্যদিকে যৌথকারবারের রক্ষিত ভাণ্ডারে ভরে উঠছে টাকার রাশ এবং তার বহুগুণিত লাভের ভাগ লুটছে জনকয়েক মোটা মোটা অংশীদার। এই সভ্যতার পরিণাম কি ভয়াবহ তা আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি—পৃথিবী জুড়ে যে বিপুল আয়োজনে হত্যাকাণ্ড চলেছে তার নৃশংসতায়; যুগযুগান্তর ধ'রে মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে যে সব কীর্তিকলাপ গড়ে উঠেছে তার নিষ্ঠুর ধ্বংসে; এবং সর্বোপরি রবট বোমা, আণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানের অপূর্ব শক্তিশালী প্রলয়ঙ্কর মারণ-অস্ত্র প্রয়োগের যে প্রবল আয়োজন দেশে দেশে চলেছে, তার নিদারুণ বিভীষিকায়। যা কিছু মানুষের জীবনে শ্রেয়, যা নিয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব, সে সব যাচ্ছে মাটির দরে বা বিনা দরে বিকিয়ে। শ্রদ্ধাপ্রীতি, স্নেহদয়া, ত্যাগ-সংযম হয়ে গেছে পুরাযুগের দুর্বলতার পরিচিহ্ন। বর্তমানযুগে সংযম আছে শুধু খাকিপরা কুচকাওয়াজে, নীতি বাঁধা পড়েছে স্বাস্থ্যরক্ষার গণ্ডির মাঝে এবং ত্যাগ ঢেকে গেছে যশের পরিকীর্তনে ও মুরুব্বিয়ানার বিজ্ঞাপনে। এই পরিবর্তন নিয়ে এসেছে বিজ্ঞান। কারণ একেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আধুনিক সভ্যতা। বিজ্ঞানের মালমসলা দিয়েই চলছে এই স্বার্থের সংগ্রাম, লোভের সংঘাত, হিংসার জাগরণ এবং জগদ্ব্যাপী রক্তারক্তির আসুরিক উন্মত্ততা। বিজ্ঞানীরা এই অপবাদের বিরুদ্ধে তর্কের খাতিরে অনেক গুরুতর যুক্তিপ্রমাণ আনবেন, কিন্তু হলপ করে পুরোপুরি অস্বীকার করতে হয়তো পারবেন না। সত্যনিষ্ঠ, বিশ্ববৈচিত্র্যে ঐক্যের সন্ধানী, উদার ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের অনুসরণে মানুষের এরূপ অবনতি ঘটতে পারে কি করে—এ প্রশ্ন সহজেই মনে জাগে।

বিজ্ঞানের দুটি দিক—ব্যবহারিক ও জ্ঞানের দিক। সাধারণ লোক এই ব্যবহারিক দিকেরই শুধু খবর পায়। এরই প্রচার হচ্ছে মানুষের প্রাত্যহিক

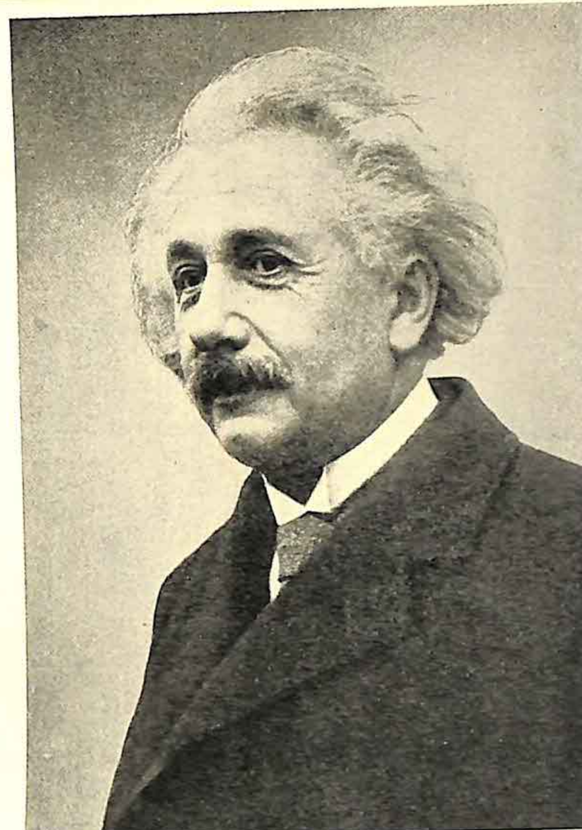
জীবনযাত্রায়। ঘাটে মাঠে পথে চলেছে এর বিজ্ঞাপন। এর স্থবিধা নিয়ে মানুষ গড়ে তুলছে তার ক্ষমতা ও অর্থ। আবার এই ক্ষমতা ও অর্থের লোভে তার ঘটছে যত অনর্থ। কিন্তু মানুষের জীবধর্ম এতেই পাচ্ছে তৃপ্তি। দেহরক্ষার প্রেরণায় যে জীবধর্ম, তার উপরেও রয়েছে মানুষের আর একটি ধর্ম যাকে কবি বলেছেন মানুষের ধর্ম ; যার প্রেরণায় মানুষ খোঁজে বিজ্ঞান-ব্রহ্মের, সত্যের, আনন্দের ও অমৃতের পথ। তার জ্ঞানের পিপাসা ও সত্য-জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে এই মানুষধর্মের প্রয়োজনে। এতে লাভালাভের হিসাব নেই—এ অত্যন্ত বেহিসাবি। স্নেহপ্রীতি, দয়ামায়া প্রভৃতি মানুষের সকল প্রকার স্থকুমার মনোবৃত্তি একেই আশ্রয় করে প্রকাশ পায়। এতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। এরই প্রেরণায় মানুষ প্রাণকে করে তুচ্ছ, দুঃখ ও মৃত্যুকে করে বরণ। এতেই সে লাভ করে তার শ্রেয় এবং পরমার্থ। বিজ্ঞানের জ্ঞানের দিক এই মানবধর্মেরই খোরাক জোগায়। বিজ্ঞানের এই দিকটা সাধারণের নিকট একরকম অপরিচিত বললেই চলে। ফলে, শুধু বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকের প্রভাবে জীবধর্মের পরিপুষ্টি বেড়ে উঠেছে অভাবনীয়রূপে, আপন কল্যাণের সীমা ছাড়িয়ে। মানুষের দেহের কোন অংশ যদি অসংযত ভাবে বেড়ে ওঠে, তখন তা সমস্ত দেহকে গ্রাস ক'রে হয় মারাত্মক। ডাক্তারেরা যাকে বলে প্রাণঘাতী অবুর্দ। জীবধর্মের এই অনাবশ্যক অসংযত বাড়তিতে চাপা পড়েছে মানুষের ধর্ম। তাই সে হয়েছে আত্মঘাতী। এই উভয় ধর্মের সামঞ্জস্যেই মানুষের কল্যাণ। মানবধর্মের উৎকর্ষ সাধন করে এই স্বার্থ ও পরমার্থের, শ্রেয় ও প্রেয়ের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে দরকার হবে সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞানের দিকের বহুল প্রচার। বিশ্বভারতী এই কাজে হাত দিয়েছেন। তাঁদের এই শুভ প্রচেষ্টা সফল হোক।

কলিকাতা
১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৫০

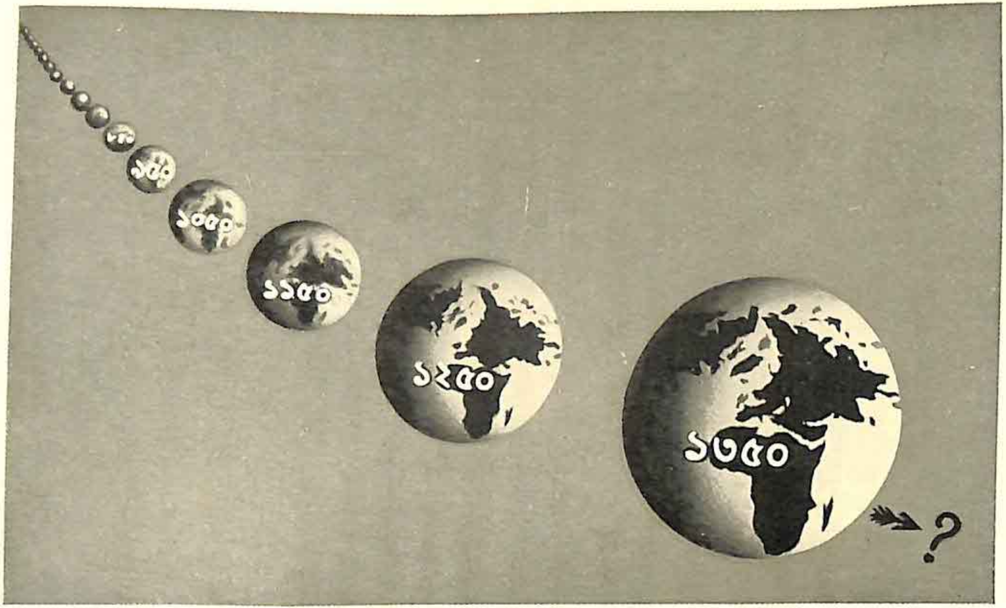
শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়



নিউটন



আইনস্টাইন



চিত্র ২] দেশ ও কালের ভিতর দিয়ে আমাদের পৃথিবী ছুটে চলেছে।

বিজ্ঞানের পন্থা ও লক্ষ্য

বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায় এ সম্বন্ধে বিবিধ সংজ্ঞার্থ প্রচলিত আছে। অনেকের মতে বস্তুজগতের বিবিধ তথ্য ও ঘটনাবলীর শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ধারাবাহিক জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা যেতে পারে ; আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, মাপের ও গুনতির দ্বারা বস্তুজগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমরা লাভ করি বা প্রকাশ করি তাই হল বিজ্ঞান। গোড়ায় বিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ দেওয়ার চেষ্টা না ক'রে এর উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

মানবশিশুর জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যখন তার ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি জেগে ওঠে, বহির্জগতের সঙ্গে তার মনের কাজকারবার তখন থেকেই শুরু হয়। রবি শশী গ্রহ তারা ও বিবিধ জ্যোতিষ্কে পরিশোভিত উর্ধ্বে নীলাকাশ, নিম্নে সসাগরা বহু জীবজন্তু-তরুলতাসমাকীর্ণ মাটির পৃথিবী, অন্তরীক্ষে মেঘ বায়ু ও জল এবং চারিদিকে আলো-আঁধারের লীলাখেলা তার শিশুমনকে চমকিত ও বিচলিত করে তোলে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের বস্তুজগতের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক ঘটে, তাতে সে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দের অনুভূতি লাভ করে। সে দেখতে পায়, এ সব অনুভূতির প্রত্যেকটিই হচ্ছে দু রকমের— একটি তাকে দেয় আনন্দ, অন্যটিতে সে পায় দুঃখ। স্বভাবের প্রেরণায় সে চায় দুঃখের অনুভূতিগুলিকে এড়াতে ও আনন্দের অনুভূতিগুলিকে বাড়াতে। এর ফলে তার মনে জেগে ওঠে বিবিধ জিজ্ঞাসা। শিশুমুখের 'কি ও কেন' প্রশ্নের অত্যাচারে উত্যক্ত বা অপ্রতিভ হন নি, এমন বয়োবৃদ্ধের সংখ্যা বিরল। সৃষ্টির আদিযুগের মানবজাতির অনুভূতি এবং মানসিক অবস্থাও ছিল এই মানবশিশুর অবস্থারই অনুরূপ। যুগযুগান্তর ধরে মানুষের মন এই সব জিজ্ঞাসারই সমাধান খুঁজছে। তারই ফলে মানুষের ধর্ম দর্শন ও বিজ্ঞান উঠেছে গড়ে।

কিসের এই জিজ্ঞাসা, কিই বা তার সমাধান? মানুষ দেখতে পায় বাইরের বস্তুজগতের সঙ্গে সংযোগ সম্বন্ধের উপরই তার সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই তার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ ও দেহরক্ষার প্রয়োজনে সে বস্তুজগতের জ্ঞানের জন্য সচেষ্ট হয়। শুধু দেহের ক্ষুধা নিবারণেও তার তৃপ্তি হয় না। কেননা তার মনের ক্ষুধা যায় এতে বেড়ে। বিশ্বের যে বৈচিত্র্য তাকে ঘিরে রয়েছে, তার রহস্য জানবার জন্য সে উৎসুক হয়ে ওঠে। বহির্জগতের বিচিত্র বস্তুনিচয়ের ও ঘটনা-পরম্পরার এবং বিবিধ শক্তির লীলাখেলার জটিলতার ভিতর সরল নিয়মের অনুসন্ধানে তার মন হয় তখন অগ্রসর।

মানুষের এই প্রচেষ্টার প্রথম ফল হল ধর্ম। এক সর্বশক্তিমান বিশ্বদেবতার কল্পনা ক'রে তাঁকে এই বিশ্বজগতের স্থষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা মেনে সে তার এই চিরন্তন জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজল; মানুষের বিচারবুদ্ধি কিন্তু এতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারে নি। সে চাইল প্রমাণ ও যুক্তি। যুক্তিপ্রমাণের অনুসন্ধানের ফলে গড়ে উঠল মানুষের দর্শন। ধর্মের ভিত্তি হল তাই বিশ্বাস, আর দর্শনের ভিত্তি হল যুক্তি। শুধু যুক্তিতর্কের সাহায্যেও মানুষের এ জিজ্ঞাসার কোন চরম মীমাংসা হল না। পরীক্ষার সাহায্যে এই যুক্তিতর্কের প্রমাণ ও সিদ্ধান্তের সত্যতা নিরূপণে সে তখন দিল মন। এতেই হল বিজ্ঞানের উৎপত্তি। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে যে সিদ্ধান্ত করা যায় এবং যা উত্তরকালে নূতন পরীক্ষায় বার বার সমর্থিত হয়, তাই হল বিজ্ঞানের সত্য; এবং এই ভাবে যে জ্ঞানের আহরণ, তাই হল বিজ্ঞানের পন্থা। অবশ্য দেহরক্ষার প্রয়োজনের তাড়নায় এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের স্বাভাবিক আকর্ষণে গোড়া থেকেই মানুষ অল্পবিস্তর বিজ্ঞানের পন্থার অনুসরণ করেছে। সুতরাং পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিসম্মত যে জ্ঞান তাকেই বলা যেতে পারে বিজ্ঞান। মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহজ বা উদ্ভাবিত যন্ত্রযোগে তীক্ষ্ণতর ও সূক্ষ্মতর প্রত্যক্ষ অনুভূতি হল এর ভিত্তি। যা অতি দূরে বলে চোখে ভাল দেখা যায় না, তাকে দেখি আমরা দূরবীন দিয়ে। যা আমাদের নজরে আসে না অতি ছোট বলে, তাকেও দেখি আমরা বড় করে

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে। তাই বিজ্ঞানের প্রমাণই হয়ে উঠল অকাট্য প্রমাণ। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তথ্যসংগ্রহ এবং বিচারবুদ্ধি সহযোগে এদের সংযোজনার ফলে বিজ্ঞানের এক-একটি সিদ্ধান্ত ও নিয়ম উঠেছে গড়ে। তাই কোন প্রকটিত সত্য, প্রত্যাদেশ, আপ্তবাক্য, সংস্কার, বিশিষ্ট মতবাদ, নীতি, শাস্ত্রের বা আচার্যের দোহাই, নিছক অনুমান বা কল্পনা বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত হতে পারে নি। বিজ্ঞানে যে সব মতবাদ বা তত্ত্বের প্রচার হয়, তাদের মালমসলা জোগায় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ। অবশ্য পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সব সময় সব রকমে নিখুঁত ও ত্রুটিহীন হতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞানীরাও মানুষ—এবং সাধারণ মানুষের মত তাদেরও ভুলভ্রান্তি ঘটে। তাই বিজ্ঞান কোন মতকে ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। নূতন আবিষ্কার বা নূতন পরীক্ষার ফলে এই সব মতবাদের প্রায়ই পরিবর্তন দেখা যায়। মানুষের পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধি যে ক্রমশ উন্নত হতে পারে, তা বিজ্ঞান নেয় মেনে। এই জন্যই বিজ্ঞানে সাম্প্রদায়িকতা বা জাতিভেদ নাই; এবং বিজ্ঞান হয়েছে আন্তর্জাতিক বিশ্বমানবের ধন।

এ সত্ত্বেও বিজ্ঞানে বিশ্বাসের স্থান নেই এ-কথা বলা যেতে পারে না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার গোড়ায় সাধারণত একটা বড় রকমের বিশ্বাস রয়েছে; এ হল প্রাকৃতিক নিয়মের একানুবর্তিতায় (Principle of Uniformity of Nature) বিশ্বাস। কোন বিশিষ্ট অবস্থায় কোন পরীক্ষায় যে ফল ফলে, ঐ একই অবস্থায় উক্ত পরীক্ষার যতই পুনঃপ্রয়োগ যে-কোন স্থানে বা যে-কোন কালেই করা হোক না কেন, ঐ একই ফলের উৎপত্তি হবে। এই হল বিজ্ঞানীদের ধ্রুব বিশ্বাস। এই বিশ্বাসটি অবশ্য অভিজ্ঞতালব্ধ। বারবার একই অবস্থায় একই পরীক্ষার পুনঃপ্রয়োগ ক'রে একই ফল পাওয়া গেছে বলে বিজ্ঞানী এই বিশ্বাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদিও এর সপক্ষে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ বা যুক্তি নেই যে ভবিষ্যতেও অতীতের অভিজ্ঞতার কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না, তথাপি এই বিশ্বাসের অভাব ঘটলে বিজ্ঞান হবে অচল। বিজ্ঞানীরা তাই বিশ্বাস করেন যে, এই বিশ্বজগৎ টিকে আছে একটি শৃঙ্খলা বা নিয়মের বাঁধনে। এই নিয়ম শাশ্বত

ও সনাতন— দেশকাল নির্বিশেষে এর অক্ষুণ্ণ প্রতিপত্তি। প্রকৃতির রাজ্য নিয়মের রাজ্য, তাতে খেয়ালের স্থান নেই। একেই আশ্রয় করে বিজ্ঞানের হেতুবাদ বা কার্যকারণতত্ত্ব গড়ে উঠেছে।

ব্যাপারটি একটি সরল দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিষ্কার করা যেতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গেছে একখণ্ড শিলা জলে ফেললে ডুবে যায়। অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতেও ভারতবর্ষ বা আমেরিকায় বা অন্য কোন স্থানে শিলা জলে ফেললে যে এরূপে ডুবে যাবে এ একটি নির্ধারিত সত্য। কয়লার আগুনে জল ফুটিয়ে বাষ্পের সাহায্যে পৃথিবীর সর্বত্র রেলগাড়ির এঞ্জিন চালানো হচ্ছে এতকাল ধরে—ভবিষ্যতেও এঞ্জিন এভাবে চলবে। এই সনাতন বিশ্বাসের কোন ব্যতিক্রম ঘটতে এ পর্যন্ত দেখা যায় নি। বিজ্ঞানের এই স্বতঃস্বীকার্যটিকে বাদ দিলে, বস্তুজগৎ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করা একেবারেই অসম্ভব। পাকা আম বৃন্তচ্যুত হলে নীচে মাটির দিকে পড়তে থাকে ; তা এ পর্যন্ত সর্বত্র সব সময়ে দেখা গেছে। কাল থেকে বা ভবিষ্যতে যদি হঠাৎ উর্ধ্বগামী হয়ে তা বেলুনের মত আকাশপথে ছুটতে থাকে, তাহলে ধরাপৃষ্ঠের মানবসন্তান যে শুধু অমৃতরসে বঞ্চিত হবে এমন নয়, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘটবে এক মহাপ্রলয়ের অভিনয়।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষের অন্তরাত্মার দুটি স্বাভাবিক প্রেরণার ফলে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। তাই বিজ্ঞানের দুটি ধারা— ব্যবহারিক ও দার্শনিক। প্রথমটির লক্ষ্য আমাদের সাংসারিক জীবনযাত্রাকে সুখ, সুবিধা, সুযোগ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য ও আরামে পরিপূর্ণ করে তোলা। দ্বিতীয়টির লক্ষ্য এই বিশাল বহির্জগতের বৈচিত্র্য ও জটিলতার মধ্যে শৃঙ্খলা ও সরল নিয়মের আবিষ্কার করে সৃষ্টিরহস্যের সমাধান করা। দ্বিতীয়টিই হল বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিকে বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হচ্ছে, তার ব্যবহারিক ধারাও তত প্রসার লাভ করছে। কারণ, মানুষের যাবতীয় দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায় মিলবে জ্ঞান বা সত্যের পথে ও প্রতিষ্ঠায়। সুতরাং আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার সুখসুবিধার এই অভূতপূর্ব উন্নতির মূলে রয়েছে মানুষের অন্তরাত্মার সেই সনাতন জিজ্ঞাসা বা জ্ঞানের পিপাসা।

বিশ্বজগতের উপাদান

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে তিনটি মূল উপাদানের সহযোগিতায় বা তাদের পরস্পর প্রতিক্রিয়ার ফলে এই বিশ্বজগতের প্রকাশ ঘটেছে। এগুলি যথাক্রমে; ১. জড় বা matter, ২. শক্তি বা energy ও ৩. চেতনা বা consciousness। কেউ কেউ এই চেতনাকে শক্তির অন্তর্ভূত করে নাম দিয়েছেন প্রাণশক্তি। তা ঠিক নয়। কারণ শক্তির সত্তা বা স্বরূপ চেতনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, যদিও প্রাণশক্তির মূলে রয়েছে চেতনার ভূমিকা। পরে আমরা এর আলোচনা করব। এই উপাদানত্রয়ের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরস্পর সম্বন্ধ জানতে পারলেই বিশ্বজগতের বা বাস্তবের স্বরূপ জানা যাবে। বিজ্ঞান এবং দর্শন মেতেছে এর সমাধানে। জড়ের ও শক্তির অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি চেতনার সাহায্যে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন কোন জড় বা শক্তির প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে, আমাদের চেতনায় তখন তা বাস্তবাকারে ফুটে ওঠে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ানুভূতির যানে আরোহন করে জড় এবং শক্তি এসে আমাদের চেতনার রাজ্যে দেখা দেয়। এই শৃঙ্খলার কোন ব্যতিক্রম ঘটলে বিশ্বজগতের অস্তিত্ব আমাদের কাছে হারিয়ে যায়। যার সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি জন্মকাল হতে বিলুপ্ত তার চেতনাও নিষ্ক্রিয়; অর্থাৎ বহির্জগতের যে কোন অস্তিত্ব আছে তা মোটেই তার ধারণায় আসে 'না।

আমাদের ত্বকের সংস্পর্শে কোন জড়পদার্থ এলে কাঠিন্য বা কোমলতার অনুভূতির দ্বারা আমরা তার অস্তিত্ব জানতে পারি; সেরূপ রসনার সংস্পর্শে কটু অম্ল লবণ তিক্ত বা মধুর রসের অনুভূতিও জড়ের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। সূক্ষ্ম জড়কণাও বাতাসে ভেসে যখন আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে এসে ঘা দেয়, তখন আমাদের গন্ধের অনুভূতি জন্মে এবং বোঝা যায় যে কোন জড় বস্তু নিকটে রয়েছে।

এভাবে শক্তিতরঙ্গ চোখে পড়লে ও শব্দতরঙ্গ শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করলে আমরা শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করি। জড়ের আকার, রূপ, গতি ও আন্দোলন এতেই আমাদের চেতনায় ফুটে ওঠে।

চেতনার চরম স্বরূপ বা প্রকৃতি একটা জটিল ও গুরুতর রহস্য। তাই এ পর্যন্ত তা বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের সীমায় এসে ধরা দেয় নি। জড় এবং শক্তির অন্তিম স্বরূপ আবিষ্কারই এখন বিজ্ঞানের একমাত্র সমস্যা।

জড় ও শক্তি

সৃষ্টির আদিযুগ হতে আরম্ভ ক'রে জড়পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে পুরাকালের পণ্ডিতেরা বিবিধ কল্পনা ও মতবাদের প্রচার করেছেন। এর দৃষ্টান্ত দেখা যায় হিন্দু দার্শনিক কণাদের (খ্রী. পূ. পঞ্চম শতক) এবং গ্রীক দার্শনিক লিউকিপ্পাস (খ্রী. পূ. ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতক) ও দেমোক্রিটাসের (খ্রী. পূ. পঞ্চম ও চতুর্থ শতক) পরমাণুবাদে। এঁদের মতে কঠিন পরমাণুর সমন্বয়ে সব রকমের জড় বস্তু গঠিত হয়েছে। এই সব পরমাণু নিরেট, অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য ; এবং এত ক্ষুদ্র যে এরা আমাদের চোখের অগোচর, এমন কি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ানুভূতিরও বাইরে। এরা সতত গতিশীল। বিভিন্ন প্রকারের জড়পদার্থ গঠিত হয়েছে এদের বিভিন্ন প্রকার সংযোগে। খ্যাতনামা গ্রীক দার্শনিক এম্পিডোক্লিস (খ্রী. পূ. পঞ্চম শতক) ও অ্যারিস্টোটলের (খ্রী. পূ. চতুর্থ শতক) মতে যাবতীয় জড়পদার্থ একই অন্তিম উপাদানে গঠিত হয়েছে। এই উপাদানটি হতে প্রথমতঃ ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ নামক চতুর্বিধ মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। কণাদের পূর্ববর্তী হিন্দু দার্শনিকেরাও, যেমন উপনিষৎকারগণ, মনে করতেন ক্ষিতি অপ, তেজ মরুৎ ও ব্যোমরূপ পাঁচটি মৌলিক উপাদান পদার্থের বা ভূতের সংযোগে এই দৃশ্যমান জড়জগতের সৃষ্টি হয়েছে। এ পঞ্চভূতের বা পাঁচ প্রকার মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটিই আবার পরমাণুপুঞ্জে গঠিত—এই হল কণাদের পরমাণুবাদের ভিত্তি।

এই সব মতবাদের কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণ বা ভিত্তি ছিল না। মাত্র খ্রীস্ট-পরবর্তী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংরেজ মনীষী রোজার বেকন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রতিভাশালী ইতালীয় বিজ্ঞানী লিউনার্ডো দা ভ্যাঁসি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের একমাত্র প্রশস্ত ও শ্রেষ্ঠ উপায় বলে নির্দেশ করেন। বিজ্ঞানচর্চার বর্তমান পরীক্ষামূলক প্রণালীর প্রবর্তন করেছেন প্রথিতনামা ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ ফ্রান্সিস বেকন (ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক)। সপ্তদশ শতকে রবার্ট বয়েল ও মহামতি নিউটনও ছিলেন পরমাণুবাদের পক্ষপাতী। সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্দিষ্টসংখ্যক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন রবার্ট বয়েল। যে সব জড়পদার্থকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাংশে পরিণত করলেও তাদের স্বকীয় ধর্মের বিলোপ ঘটে না, কিংবা তা থেকে অন্য কোন নূতন ধর্মের পদার্থ পাওয়া যায় না, তাকেই বয়েল বলেছেন মৌলিক পদার্থ। এর কিছুকাল পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে রাসায়নিক সংযোগবিধিসমূহের আবিষ্কার হয়। এই সব বিধিবিধানের ব্যাখ্যা দিলেন মহামতি ডল্টন তাঁর পরমাণুবাদের সাহায্যে। তাই ডল্টনের পরমাণুবাদকে বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদ বলা হয়ে থাকে। এই পরমাণু-বাদকে ভিত্তি করেই আধুনিক রসায়নের বিচিত্র সৌধ গড়ে উঠেছে।

ডল্টনের পরমাণুবাদের ভিত্তি হচ্ছে তিনটি প্রধান স্বীকার্য। যথা :

১. সব রকমের মৌলিক পদার্থ অতি সূক্ষ্ম, অখণ্ডনীয় এবং নিরেট কণার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে ; এদের পরমাণু বলা হয়।

২. একই মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণু একই ওজনের। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন বিভিন্ন।

৩. পরমাণুর পরস্পর মিলনে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক পরমাণু মিলে একটি অণুর সৃষ্টি করে। কোন মৌলিক পদার্থের একটি অণুর সৃষ্টি হয় দুই বা বহু পরমাণু মিলে। একটি নূতন যৌগিক পদার্থের অণুর সৃষ্টি হয় দুই বা বহু বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সংযোগে। জল একটি

যৌগিক পদার্থ। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুই বিভিন্ন মারুতপদার্থের পরমাণুর সংযোগে তার এক-একটি অণুর সৃষ্টি হয়েছে।

জড় পদার্থের অন্তিম উপাদান সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ সিদ্ধান্তই বিজ্ঞানীরা করেছিলেন। তাঁদের বহুমুখী পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তাঁরা এই পরমাণুবাদের পাকাপাকি প্রতিষ্ঠা করে যান। এই সব পরীক্ষার ফলে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা স্থির হয়েছে ৯২ অঙ্কে। কোন যৌগিক পদার্থের সকল অণুর ধর্ম ও ওজন যে সমান, এও পরীক্ষার ফলে স্থির হয়।

বলা বাহুল্য, এই সব অণুপরমাণু এতই সূক্ষ্ম যে তাদের আমরা দেখতে পাই না, এমন কি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও না। মোটামুটি বলতে গেলে একটি অণু বা পরমাণুর আকার এতই ক্ষুদ্র যে তার ব্যাস এক ইঞ্চির ২০ কোটি ভাগের এক ভাগের সমান। একটি ফুটবলের আকার লৌহপিণ্ডকে যদি পৃথিবীর আকারের সমান ক'রে বাড়ান হয়, তবে তার এক-একটি পরমাণু হবে ফুটবলের আকার। এ থেকেই অণুপরমাণুর ক্ষুদ্রতার একটি ধারণা করা যেতে পারে। রূপকের সাহায্যে এর আরও একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। পণ্ডিতেরা গণনায় দেখেছেন যে এক ঘনায়তন ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে কোটি কোটি হাইড্রোজেন বা অন্য কোন মারুতপদার্থের অণু অবস্থান করতে পারে। এখন এই ঘনায়তন ইঞ্চি পরিমিত হাইড্রোজেন গ্যাসকে এমনভাবে বাড়ানো যাক যে তার একটি অণুর আকার হয় যেন এক-একটি কমলালেবুর সমান। যদি এর পর দশ হাজার লোককে এই কমলালেবুর আকারের প্রত্যেক অণুকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে সরাবার জন্যে নিযুক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যদি দিনরাত শীতগ্রীষ্মনির্বিশেষে অহরহ প্রতি সেকেণ্ডে একটি করে অণু সরাতে থাকে, তবে ২০ কোটি বছর কেটে যাবে তাদের এ কাজ শেষ করতে।

পূর্বে বলা হয়েছে পরমাণুমাত্রই নিরেট, অখণ্ড ও অবিনশ্বর। ৯২ প্রকার পরমাণুর বিভিন্ন প্রকার সংযোগ-সংহতির ফলে সব রকমের জড়পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে প্রত্যেক-জাতীয় পরমাণুরই একটি

বিশিষ্ট ওজন বা গুরুত্ব আছে। সুতরাং পরমাণুগঠিত জড়পদার্থেরও কদাচ বিলোপ ঘটতে কিংবা সাধারণত উহাদের ওজনের কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে এ সত্য প্রমাণ করেছিলেন। একটি মোমবাতি যখন জ্বলে, উহা ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যায়; তাতে কিন্তু তার বস্তুসামগ্রীর কোন বিনাশ ঘটে না, তা পরীক্ষায় প্রমাণ করা যায়। কারণ, তখন বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে সংযোগের ফলে জলীয় বাষ্প ও অঙ্গারাম্ল গ্যাস রূপে তার পরিণতি ঘটে। ঐ জলীয় বাষ্প ও অঙ্গারাম্ল গ্যাস হতে অক্সিজেনের অংশ বাদ দিলে যে ওজন বাকি থাকে, দেখা যায় তা ঐ মোমবাতির ক্ষয়ে-যাওয়া অংশের ওজনের সঙ্গে মিলে যায়। উভয় ওজনের মধ্যে কোনপ্রকার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এ থেকেই জড়পদার্থের নিত্যতাবাদের (Law of Conservation of Matter) প্রতিষ্ঠা হয়। অর্থাৎ প্রমাণ হল জড়পদার্থের বিকার বা রূপান্তর ঘটতে পারে, কিন্তু বিনাশ ঘটে না। সুতরাং প্রকৃতিদেবীর ভাণ্ডারে জড়পদার্থের মোট ওজনের বা পরিমাণের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটল না। অষ্টাদশ শতকে বিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ্ লেভাইসিয়ার এই নীতির প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন।

এখন আমরা শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের আলোচনা করব। জড় ও শক্তির প্রতিক্রিয়ার ফলে এই দৃশ্যমান ব্যাবর্তক জগৎ আমাদের চেতনায় জেগে ওঠে। জড়ের সংযোগবিহীন শক্তির অস্তিত্ব আমরা অনুভব করতে পারি না। সেরূপ শক্তিহীন জড়ের অস্তিত্বের কল্পনা বা প্রমাণও সম্ভবপর নয়। শক্তির কোন ওজন নেই। কারণ একটা লৌহদণ্ডকে যদি প্রথম শীতল, পরে তপ্তোজ্জ্বল অবস্থায় এবং পুনরায় যখন তাপশক্তি বিকিরণের পর আবার শীতল হয়, এই ত্রিবিধ অবস্থায় ওজন করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে ওর ওজন সকল অবস্থাতেই সমান থাকে। গুরুত্ব বা ওজন জড়পদার্থের একটি বিশিষ্ট ধর্ম। সুতরাং এতে প্রমাণ হয় যে জড়পদার্থ ও শক্তি মূলত পৃথক। যান্ত্রিক শক্তি, তাপশক্তি, আলোকশক্তি, শব্দশক্তি, রাসায়নিক শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি ও চৌম্বক শক্তি এই বিভিন্ন রূপে শক্তি আমাদের নিকট দেখা দেয়। এদের মধ্যে পরস্পর

রূপান্তর ঘটে থাকে। পরীক্ষা ও বিচারের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন যে শক্তির রূপান্তর ঘটলেও বিনাশ ঘটে না। অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে জড়পদার্থের ন্যায় শক্তিরও মোট পরিমাণ বজায় থাকে। এ থেকেই শক্তির নিত্যতাবাদের (Law of Conservation of Energy) প্রতিষ্ঠা হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা গেছে যে অণুপরমাণুমাত্রই চঞ্চল ও গতিশীল, তারা কখনও স্থির থাকতে পারে না। এই অনুমানের সাহায্যেই ক্লাউসিয়াস, জুল ও ম্যাক্স্‌ওয়েল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গ্যাস বা মারুতপদার্থের যাবতীয় ধর্ম এবং তাপ-শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করেন। অণুপরমাণুর এই স্বতশ্চঞ্চলতা ও ক্রিয়াশীলতাই যে সব রকম শক্তির মূল তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না। শক্তি বললে আমরা কি বুঝি? যার প্রভাবে কোন কার্য বা ঘটনা ঘটে তারই নাম হল শক্তি। ঢিল ছুঁড়ে যখন জানালার কাঁচ ভাঙা হয় তখন ঐ কাজটি ঘটে ঢিলের গতিশক্তি হতে, অবশ্য ঢিলের গতিশক্তি জন্মেছিল যে ঢিল ছুঁড়েছিল তার দৈহিক শক্তি হতে। কয়লা পোড়ালে যে তাপ হয় তাতে জলকে বাষ্প করা যায়, এই বাষ্পের সাহায্যে স্টীম-এঞ্জিন চলে। সুতরাং তাপ একটি শক্তি।

তিনটি বিভিন্ন উপায়ে শক্তি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিচালিত হয়।

১. কোন জড়পদার্থের ভিতর দিয়ে: যেমন দড়ি বা বেল্ট দিয়ে একটি চলনশীল চাকার শক্তি দূরে অন্য চাকায় প্রেরণ করা যায়; অথবা যেমন একটি লৌহদণ্ডের এক প্রান্ত আগুনে ধরলে অন্য প্রান্তেও তা গরম হয়ে ওঠে।

২. নিক্ষিপ্ত বস্তুর গতিশক্তির সাহায্যে: যেমন বন্দুক হতে গুলি ছুঁড়ে বা ঢিল ছুঁড়ে জানালার কাঁচ ভাঙতে পারা যায়।

৩. তরঙ্গের সাহায্যে: যেমন বায়ুর মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি ক'রে শব্দের শক্তি চলে; অথবা জলে ঢেউ তুলে ঝড়ের শক্তি যেমন নৌকা বা স্টীমারকে ঝাঁকানি দেয়।

সূর্য হতে আমরা তাপ ও আলোকশক্তি পাই। সূর্য আছে আমাদের পৃথিবী হতে প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে। আলোকশক্তি প্রতি সেকেণ্ডে চলে

প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল। আলোকশক্তির এই প্রচণ্ড গতির কোন ধারণা আমরা করতে পারি না। কোন জড়বস্তু এত অভাবনীয় দ্রুতগতিতে চলতে পারে না। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে আলোকশক্তি কোনরূপ জড়পদার্থের সাহায্যে চলে না।

আলোকশক্তিও যে জড়পদার্থের ন্যায় অণুসমবায়ে গঠিত, তা পরম বৈজ্ঞানিক মহামতি নিউটন (সপ্তদশ শতাব্দী) আলোকরশ্মির ঋজুরেখ গতি হতে ও তার প্রতিফলনের এবং প্রতিসরণের নিয়ম হতে সিদ্ধান্ত করেন। তাই সূর্যকিরণ পৃথিবীর উপর আসছে এই প্রচণ্ড গতিশীল আলোকাণুর ধারারূপে। এই হল নিউটনের 'আলোক-কণিকা-বাদ' (Corpuscular Theory of Light)। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর হিউগেন্স্ পরীক্ষার ফলে দেখালেন যে, দুটি আলোকরশ্মি যখন একই দিকে এসে কোন বিশিষ্ট অবস্থায় মিলিত হয়, তখন তারা পরস্পরকে বিলোপ করে এবং তার ফলে আলোকের অভাব বা অন্ধকারের সৃজন হয়। এতে নিউটনের মতবাদের প্রতিপত্তি গেল কমে। কারণ একই দিকে চলতি দুটি আলোককণা কখনও পরস্পরকে বিনষ্ট করতে পারে না। তাই হিউগেন্স্ সিদ্ধান্ত করলেন, আলোকশক্তি ঢেউ তুলে চলে। কেননা একই দিকে চলতি দুটি শক্তি-তরঙ্গ অবস্থা-বিশেষে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করতে পারে। অর্থাৎ যখন একটি ঢেউএর মাথা পড়ে অন্যটির তলার উপর তখন দুটি বিপরীতমুখী তরঙ্গ যায় অদৃশ্য হয়ে।

আমরা পূর্বেই দেখেছি শক্তির পরস্পর রূপান্তর ঘটে। অতএব বিভিন্ন শক্তির মধ্যে কোন প্রকৃতিগত ভেদ নেই। কিন্তু শক্তি জড়পদার্থ নয়। তাই এখন প্রশ্ন ওঠে, আলোকশক্তি তাপশক্তি কিংবা শক্তিমাত্রই যদি তরঙ্গরূপে পরি-চালিত হয়, তবে কার কম্পনের ফলে এই সব শক্তিতরঙ্গের উৎপত্তি ঘটে, এবং কোন্ পদার্থের ভিতর তরঙ্গ তুলে তারা চলাচল করে। শেষোক্ত প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে তখনকার পণ্ডিতগণ সুদূর তারকামণ্ডল অবধি সমস্ত দেশ জুড়ে যা অবস্থিতি করে, সমস্ত জড়পদার্থের মধ্যে যা অনুপ্রবেশ করে, এরূপ এক অদৃশ্য গুরুত্বহীন স্থিতিস্থাপক কিম্ভূতকিমাকার পদার্থের কল্পনা করেছেন। এর নাম দেওয়া

হয়েছে ঈথর বা ব্যোম। এই ঈথর বা ব্যোমের প্রকৃত অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই। এটা বিজ্ঞানীদের একপ্রকার মানস-সৃষ্টি। এই ঈথর বা ব্যোমরূপী পদার্থের তরঙ্গে আরোহণ করে আলোক বা শক্তি চলাচল করে। প্রথম প্রশ্নের সমাধান সহজ। পদার্থমাত্রই যখন অণুপরমাণুর সমষ্টি এবং এই সব অণুপরমাণু যখন সতত গতিশীল, তখন এদের কম্পন থেকেই তাপ ও আলোকশক্তির উদ্ভব ঘটে। তাপ যে গতিশক্তিরই রূপান্তর এর অনেক সুন্দর পরীক্ষা আছে। একথাও সকলের জানা আছে যে কোন বস্তু খুব উত্তপ্ত হলে তা থেকে আলোক বেরোয়। তবে অণুপরমাণুর কম্পনে যে সকলপ্রকার আলোকশক্তিরই উদ্ভব হয় একথা ঠিক করে বলা যায় না। আমরা পরে দেখব সাধারণত পরমাণুর ভিতরকার ইলেক্ট্রন বা বিদ্যুৎকণার কম্পন হতেই আলোকের উৎপত্তি হয়। জড় ও শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা যা সিদ্ধান্ত করেছিলেন তা মোটামুটি এই :

১. প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ পরমাণুপুঞ্জে গঠিত হয়েছে। পরমাণুর বিনাশ নেই, তাদের ভাঙা যায় না। এরা অচ্ছেদ্য অভেদ্য সনাতন নিত্য বস্তু।

২. ৯২ প্রকার বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অণুপরমাণুর পরস্পর সংযোগ, বিয়োগ ও সংহতির ফলে এই পরিদৃশ্যমান জড়জগতের সৃষ্টি হয়েছে। মৌলিক পদার্থের রূপান্তর বা বিকার ঘটে না, যৌগিক পদার্থের রূপান্তর ঘটতে পারে।

৩. পদার্থের বিনাশ নেই।

৪. শক্তি জড়পদার্থ হতে সম্পূর্ণ পৃথক।

৫. শক্তি ঈথর বা ব্যোম-তরঙ্গের সাহায্যে চলাচল করে।

৬. শক্তির রূপান্তর ঘটতে পারে, কিন্তু বিনাশ হয় না।

অতএব আমরা দেখতে পাই প্রকৃতির একানুবর্তিতায় বিশ্বাস, পরমাণুবাদ, জড়পদার্থের নিত্যতাবাদ ও শক্তির সংরক্ষণবাদ, এ সবই হল উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের ভিত্তি।

গত শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত রুশ রাসায়নিক মেণ্ডেলিফ মৌলিক পদার্থের আবর্তনপ্রণালীর (Periodic Law of Elements) প্রচার করেন।

রসায়নবিজ্ঞানের ইহা হচ্ছে একটি চিরস্থায়ী গৌরবস্তম্ভ; ইহা হ'তেই উদ্ভব হয়েছে সুনির্দিষ্ট পথে রসায়নের দ্রুত অগ্রগতির প্রেরণা। এই প্রণালীমতে ৯২টি মৌলিক পদার্থকে তাদের পরমাণুর গুরুত্বের বৃদ্ধি অনুক্রমে কয়েকটি অনুভূমিক শ্রেণীতে সাজান হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে, যাদের মধ্যে ধর্মগত পরস্পর সাদৃশ্য আছে সেসব পদার্থ প্রায়ই স্থান পায় একই লম্বপংক্তিতে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট গুরুত্বের ব্যবধানে মৌলিক পদার্থের স্বাভাবিক ধর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মধ্যে যে একটি অন্তর্গত সাদৃশ্য বা ঐক্য রয়েছে এ হতে আমরা তার একটি নিগূঢ় নির্দেশ পাই।

বিদ্যুৎশক্তি ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, তার আবিষ্কার করেন এরও বহুপূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহামতি ফ্যারাডে। এই সম্বন্ধ বোঝাবার জন্য তিনি দুটি বিধানের ব্যবস্থা করে গেছেন। এই বিধি দুটির গুরুত্ব তখনকার বিজ্ঞানীমহল ভাল করে বুঝতে পারেননি। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে এই সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী হেল্ম্‌হোল্‌জ। তিনি তাঁর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন: "জড়পদার্থের পরমাণুবাদ যদি আমরা মেনে নিই, তবে বিদ্যুৎশক্তিও যে বিদ্যুৎ-কণার সমবায়ে গঠিত হয়েছে এও স্বীকার করে নিতে হয়।" অর্থাৎ বিদ্যুৎশক্তি যে স্রোতের মত একটানা চলে না, তাও যে জড়বস্তুর মত কণিকার সমষ্টি, এখানে আমরা তারই প্রথম আভাস পাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অনেক নূতন ও অদ্ভুত তথ্যের আবিষ্কার হয়। এর ফলে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মধ্যে অনেক ওলটপালট হয়ে গেছে।

একটি পাত্রে আবদ্ধ খুব অল্পপরিমাণ কোন গ্যাসের ভিতর বিদ্যুৎশক্তি চালিয়ে ক্রুক্‌স প্রমুখ পণ্ডিতগণ দেখলেন যে তাতে এক প্রকার নূতন আলোকরশ্মির সৃষ্টি হয়। এই আলোকরশ্মি সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা ও গবেষণা করেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী জে. জে. টম্‌সন্‌। টম্‌সন্‌ তাঁর পরীক্ষার সাহায্যে সিদ্ধান্ত

করলেন যে, এই সব আলোকরশ্মি সাধারণ আলোকরশ্মির মত ঈথর বা ব্যোমের কম্পন নয়। এরা negative বা না-ধর্মী বিদ্যুৎকণার সমষ্টি। পণ্ডিতপ্রবর টম্‌সন্ এই সব বিদ্যুৎকণার ওজন, গতি ও বিদ্যুৎমাত্রার পরিমাণ নির্ণয় করেন। খ্যতনামা মার্কিন বিজ্ঞানী মিলিকানের পরীক্ষা এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বহুকাল ধরে বহু আয়াসে যে সব পরীক্ষা করেন, তাতে এই সব শক্তিকণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎমাত্রার পরিমাণ চূড়ান্ত ভাবে নির্ণীত হয়েছে। এই সব না-ধর্মী বিদ্যুৎবাহী কণাকে ইলেক্‌ট্রন বলা হয়েছে। টম্‌সন্ ও মিলিকান প্রমুখ পণ্ডিতগণের পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ হল যে, এই সব ইলেকট্রনের ওজন খুব কম। জড় পদার্থের মধ্যে সব চেয়ে হাল্কা হাইড্রোজেন গ্যাসের একটি পরমাণু ওজনে ইলেকট্রন হতে ১,৮৪০ গুণ ভারী। এই কারণে ইলেকট্রনকে না-ধর্মী বিদ্যুতের পরমাণু বলা হয়। পরীক্ষায় আরও প্রমাণ হল যে, সকল প্রকার মৌলিক পদার্থ হতেই বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে ইলেক্‌ট্রন-রশ্মির সৃষ্টি করা যায়। ক্ষুদ্রতম ও লঘুতম জড় পরমাণু হতেও যখন এই ইলেক্‌ট্রন অনেকাংশে ক্ষুদ্র ও লঘু, তখন এরা তথাকথিত অখণ্ড অভেদ্য যাবতীয় জড়পরমাণুর যে একটি সাধারণ উপাদান তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না।

ঠিক এই সময়েই ফরাসী বিজ্ঞানী বেকারেল দেখতে পেলেন যে, ইউরেনিয়াম নামক ধাতু বা উক্ত ধাতুগঠিত পদার্থ থেকে এই ইলেক্‌ট্রন-রশ্মি অনবরত বেরিয়ে আসছে। এর অল্পকাল পরেই পলোনিয়াম ও রেডিয়াম ধাতুর আবিষ্কার করেন বিখ্যাত বিদুষী মহিলা মাদাম কুরী। মাদাম কুরীর পরীক্ষায় প্রমাণ হল যে পলোনিয়াম এবং রেডিয়াম ও উক্ত ধাতুঘটিত যাবতীয় পদার্থ হতে সব সময়েই তিন প্রকারের রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে। এদের নাম দেওয়া গেছে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি। বিটা-রশ্মির সঙ্গে ইলেক্‌ট্রন-রশ্মির কোন প্রভেদ নেই, আলফা-রশ্মি positive বা হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎযুক্ত হিলিয়াম (একজাতীয় লঘু গ্যাস) পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু। গামা-রশ্মি সাধারণ আলোকরশ্মির অনুরূপ ঈথর বা ব্যোমের কম্পন। রাদারফোর্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় আরও দেখা গেল

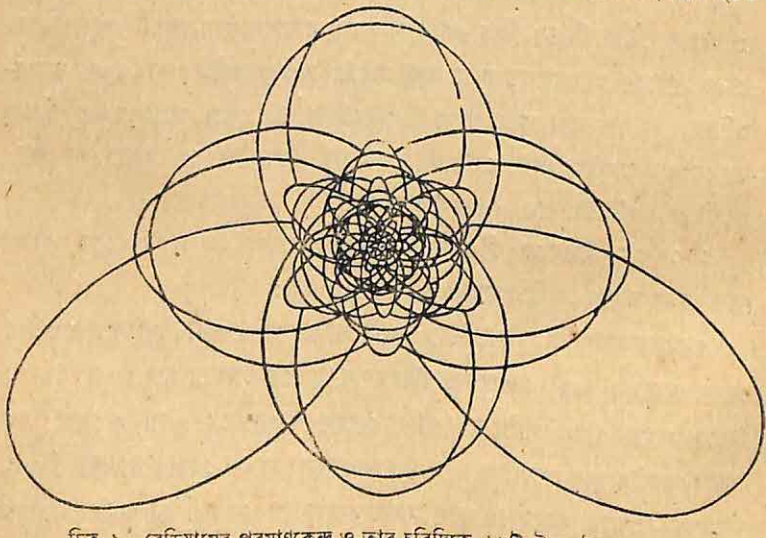
যে, এই সব রশ্মি বিকিরণ ক'রে রেডিয়াম বা পলোনিয়াম পরমাণু ক্রমশ ভেঙে অন্যবিধ নূতন জড়পরমাণুতে ও পরিশেষে সীসকে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটেনা, এবং তাদের পরমাণু অখণ্ড, নিরেট ও নিত্য— উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের এই সিদ্ধান্ত আর টিকতে পারল না।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী রঞ্জেন এক নূতন আলোকরশ্মির আবিষ্কার করেন। পূর্বোক্ত ইলেক্‌ট্রন-রশ্মি কোন জড়পদার্থের উপর পড়লে তার সংঘাতে ঐ জড়পদার্থ হতে এক প্রকার তীব্র আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসে; একে রঞ্জেন-রশ্মি বা X-রশ্মি বলা হয়। এই রশ্মি অনেক কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়ে বিনা বাধায় চলাচল করতে পারে। কোন মানুষ এর সামনে দাঁড়ালে তার দেহের ভিতরকার হাড়গুলি বেশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। কারণ আমাদের মাংস ও মাংসপেশীর ভিতর দিয়ে এই রশ্মি যায় অনায়াসে পার হয়ে। অর্থাৎ কাঁচ যেমন সাধারণ আলোকের পক্ষে স্বচ্ছ সেইরূপ অনেক কঠিন পদার্থও এই রঞ্জেন-রশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ বলা যেতে পারে। এই রশ্মির পথে কোন গ্যাসের অণু পড়লে তা থেকে ইলেক্‌ট্রন আসে বেরিয়ে। সুতরাং ইলেক্‌ট্রন যে জড়াণু বা জড়-পরমাণুর একটি উপাদান, এও হল তার প্রমাণ।

১৯১১-১৩ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড ও বয়র এই সব পরীক্ষা হতে জড়পরমাণুর যে চিত্র কল্পনা করেছেন তা এই:

প্রত্যেক জড়পরমাণুর অভ্যন্তরে একটি অতি সূক্ষ্ম, হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎযুক্ত গুরুভার কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রের চারদিকে সূর্যের চারদিককার গ্রহের মত, চক্র বা উপচক্রাকারে প্রবল গতিতে (প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৩০০ মাইল বেগে) সব সময় ইলেক্‌ট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা কেন্দ্রস্থ হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎ এককের সংখ্যার সমান। ফলে, সমগ্র পরমাণুতে কোন বিদ্যুদ্ধর্মের আপাত লক্ষণ দেখা যায় না। পরমাণুর প্রায় সমগ্র ওজনই ঐ কেন্দ্রে ঘনীভূত। বাইরের ইলেক্‌ট্রনের ওজন কেন্দ্রের ওজনের তুলনায় প্রায় নগণ্য। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, দুই বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং দুই সমধর্মী বিদ্যুৎ

পরস্পরকে বিতাড়িত করে। এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎযুক্ত কেন্দ্রের আকর্ষণ সত্ত্বেও এই সব না-ধর্মী ইলেকট্রন পরমাণুকেন্দ্রকে ঘিরে কিভাবে বহির্মণ্ডলীতে অবস্থান করে? কোন বস্তু বা জড়কণিকা যখন চক্রাকারে ঘুরতে থাকে তখন তাতে তার বেগের অনুযায়ী এমন একটি বলের সৃষ্টি হয় যা তাকে তার চক্রপথ থেকে বাইরের দিকে ছিটকে দেয়। এই বলকে কেন্দ্রাতিগ বা centrifugal বল বলা হয়। এই গতিশীল জড়কণিকা বা বস্তুকে যদি কোন বিপরীত বল কেন্দ্রের দিকে সমান জোরে আকর্ষণ করে তবে এই উভয় বলের সামঞ্জস্যের ফলে এই জড়কণিকার চক্রপথ অব্যাহত থাকে। কেন্দ্রের চতুর্দিকে ভ্রমণশীল ইলেক্‌ট্রনমণ্ডলীর চক্রপথও এইভাবে রয়েছে টিকে। যদি কোনকালে কেন্দ্রের টান এই কেন্দ্রাতিগ বলের মাত্রাকে অতিক্রম করে তবে বহির্মণ্ডল হতে



চিত্র ১—রেডিয়ামের পরমাণুকেন্দ্র ও তার চরিদিকে ৮৮টি ইলেক্‌ট্রনের ভ্রমণপথ

সমস্ত ইলেক্‌ট্রন কেন্দ্রের উপর পড়ে তার সঙ্গে যাবে মিলে। সেরূপ যদি এই কেন্দ্রাতিগ বল কোনো সময় কেন্দ্রের টানকে ছাড়িয়ে যায়, তবে আপন মণ্ডলী

ছেড়ে সমস্ত ইলেক্ট্রন যাবে পালিয়ে। এই উভয় অবস্থায় পরমাণুটি হবে ভেঙে চুরমার। সূর্যের চারদিকে ভ্রমণশীল গ্রহগণের আপন কক্ষে অবস্থিতিও এই কারণে সম্ভব হয়েছে। পরমাণুর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যাটি যদিও সম্পূর্ণ নয়, তথাপি একে আমরা আপাতত মেনে নিতে পারি। ১নং চিত্রে একটি রেডিয়াম পরমাণুর গঠন-কৌশল দেখান হয়েছে। রেডিয়ামের পরমাণুকেন্দ্রে হাঁ-ধর্মী বিদ্যুতের ভার হচ্ছে ৮৮ সংখ্যক এককের সমান। সুতরাং ঐ কেন্দ্রের চারদিকে ৮৮টি ইলেক্ট্রন নিজ নিজ চক্রপথে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আয়তনে একটি ইলেক্ট্রন সমগ্র পরমাণুর আয়তনের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের সমান। এর ব্যাস পরমাণুর ব্যাসের মাত্র $\frac{১}{৫০০০০}$ বলা যেতে পারে।

একটি হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটন বলা হয়। এতে আছে হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎ এককের ভার। সকল মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুই সর্বাপেক্ষা হালকা ও লঘু। সুতরাং হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর সমগ্র ওজন রয়েছে ঐ প্রোটনে। কিন্তু ঐ প্রোটনের ব্যাস ইলেক্ট্রনের ব্যাসের মাত্র $\frac{১}{২০০০০}$ ভাগ।

অতএব একটি কেন্দ্রীয় প্রোটন ও তার চতুর্দিকে বৃত্তাকারে ভ্রমণশীল একটা ইলেক্ট্রনে গঠিত হয়েছে একটি হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু।

এই হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর মধ্যে প্রোটন ও ইলেক্ট্রনের অবস্থান এবং তাদের পরস্পর দূরত্বের ধারণা করতে হলে একটি কাল্পনিক চিত্রের সাহায্য নিতে হয়। যদি কেন্দ্রীয় প্রোটনের আয়তন একটি মটরের আয়তনের সমান কল্পনা করা যায়, তবে ইলেক্ট্রনের ব্যাস হবে ৩০ ফিট। উহা প্রোটন হতে ৩০০ মাইল দূরে থাকবে এবং প্রোটনকে কেন্দ্র করে চক্রপথে ঘুরবে। অর্থাৎ যদি এই মটরাকারের প্রোটনটি থাকে কলকাতায় তবে ইলেক্ট্রনটি থাকবে পাটনার মত কোন দূরস্থ শহরের পরিধিতে। পরমাণু যে কতটা ফাঁপা বা তার অভ্যন্তর-প্রদেশ যে কিরূপ খালি, এ হতে তার একটা ধারণা করতে পারা যায়।

অন্যান্য মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রে প্রোটন ভিন্ন আরও একপ্রকারের কণিকা

থাকে। তার নাম নিউট্রন। নির্দিষ্টসংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন মিলে বিভিন্ন জাতীয় মৌলিক পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রের উৎপত্তি করেছে। এই নিউট্রনের ওজন হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর বা প্রোটনের প্রায় সমান। নিউট্রনে কোন প্রকার বিদ্যুতের ভার নেই। বিজ্ঞানী সেড্‌উইক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে এর সন্ধান পান।

আমরা দেখতে পাচ্ছি বিংশতাব্দীর পরীক্ষার ফলে ডল্টনের পরমাণুবাদের প্রথম স্বীকার্য এখন আর চলতে পারে না। অর্থাৎ পরমাণুকে আর অচ্ছেদ্যোহয়ম্ অভেদ্যোহয়ম্ এবং নিত্য ও নিরেট বলা যায় না। উহা নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমবায়ে গঠিত, উহা অনিত্য; কারণ এক পরমাণু ভেঙে নূতন নূতন পরমাণু গঠিত হতে পারে। উহা রন্ধ্রবহুল, কারণ এর অভ্যন্তরপ্রদেশ একেবারে খালি বললেও অত্যুক্তি হয় না। মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে মূলত কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। সকল পদার্থের পরমাণু একই উপাদানে গঠিত।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আরও অনেক অদ্ভুত তথ্যের আবিষ্কার করেছেন। তাতে পরমাণু যে নিত্য বা অখণ্ড নয় তার বহু নূতন নূতন প্রমাণ পাওয়া গেছে। অধিকাংশ মৌলিক পদার্থের পরমাণু ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম বা পলোনিয়াম ধাতুর পরমাণুর মত স্বতঃভঙ্গুর বা অস্থায়ী নয়। কিন্তু পণ্ডিতেরা তাঁদের পরীক্ষাগারে এইরূপ সাধারণত স্থায়ী পরমাণুকেও ভেঙেছেন আল্‌ফা-রশ্মি, নিউট্রন বা বেগবান প্রোটন ছুঁড়ে। এতে কোন এক জাতীয় স্থায়ী পরমাণু হতে অন্যবিধ অস্থায়ী বা স্থায়ী পদার্থের পরমাণুর উৎপত্তি হয়।

ব্লেকেট ও এণ্ডারসন প্রমুখ পণ্ডিতেরা না-ধর্মী বিদ্যুৎকণা বা ইলেক্‌ট্রনের অনুরূপ হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎকণারও আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন পজিট্রন। ইলেক্‌ট্রনের ওজনের সমান এর ওজন।

ডল্টনের দ্বিতীয় স্বীকার্যটিও আধুনিক পরীক্ষার ফলে ভ্রান্তিপূর্ণ বলে প্রমাণ হয়েছে। টম্‌সন্ ও এস্টন প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন যে একই পদার্থের সকল পরমাণুর ওজন ঠিক সমান নয়; দুই বা ততোধিক বিভিন্ন ওজনের

পরমাণুর সমষ্টিতে প্রায় প্রত্যেক মৌলিক পদার্থই গঠিত। ওজনের এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই পদার্থের পরমাণুসমূহের মধ্যে কোন ধর্মগত বিভিন্নতা দেখা যায় না। এইজন্য একই পদার্থের বিভিন্ন ওজনের পরমাণু-প্রকারকে 'একস্থানিক' (Isotope) বলা হয়েছে। একই পদার্থের পরমাণুর মধ্যে অবশ্য এই ওজনের বিভিন্নতাটুকু অতি সামান্য। এস্টনের উদ্ভাবিত 'ভরলিপিযন্ত্রে'র (Mass Spectrograph) সাহায্যে একই ধর্মাবলম্বী পরমাণুর মধ্যে তাদের ওজনের তফাৎ নির্ণয় করা যায়। ওজনের এই বিভিন্নতার কারণ পরমাণুর গঠনকৌশল হতে সহজে বোঝা যায়। আমরা দেখেছি নির্দিষ্টসংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন সহযোগে এক-একটি নির্দিষ্ট মৌলিক পাদর্থের পরমাণুকেন্দ্র গঠিত হয়েছে। কেন্দ্রস্থ প্রোটনের সংখ্যার সমানসংখ্যক ইলেকট্রন ঐ কেন্দ্রের চারদিকে আপন আপন কক্ষপথে প্রবলবেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন্দ্রটির বিদ্যুৎ-মাত্রার পরিমাণের উপর পরমাণুর যাবতীয় ধর্ম নির্ভর করে। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রে থাকে এক-একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বিদ্যুৎ-মাত্রার ভার। আমরা দেখেছি যে পরমাণুর ওজন নির্ভর করে কেন্দ্রস্থ নিউট্রন প্রোটনের সংখ্যার উপর। প্রোটনের সংখ্যা ঠিক রেখে যদি কেন্দ্রে নিউট্রনের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তবে পরমাণুর ওজনেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে; কিন্তু তাতে কেন্দ্রস্থ বিদ্যুৎ-এককের সংখ্যার কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না। ফলে একই ধর্মের বিভিন্ন ওজনের পরমাণু গড়ে উঠবে। একই মৌলিক পদার্থ যে দুই বা বহু একস্থানিক বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর সমষ্টি হতে পারে এ থেকেই তা সহজে বোঝা যায়।

পরমাণুকেন্দ্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আরও একটি গুরুতর সমস্যা আছে। কেন্দ্রে যখন প্রোটনের সংখ্যা বাড়তে থাকে, তখন সমধর্মী প্রোটন পরস্পরকে বিতাড়িত করবার চেষ্টা করে। এতে পরামাণুকেন্দ্র সহজে ভেঙে যেতে পারে। সুতরাং কেন্দ্রে এমন একটা আকর্ষণী বল আছে যা প্রোটনের এই পরস্পর বিতাড়ন বা বিকর্ষণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। এই আকর্ষণী বলের উৎপত্তি নির্দেশ করেছেন সুবিখ্যাত অষ্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ। তাঁর মতে কেন্দ্রস্থ নিউট্রন

ও প্রোটনের মধ্যে রয়েছে পরস্পরের প্রতি একটি প্রবল আকর্ষণ। এই আকর্ষণের সৃষ্টি হয় নিউট্রন ও প্রোটনের পরস্পর রূপান্তরে। গুরুভার মৌলিক পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রে যেখানে প্রোটনের সংখ্যার বাড়াবাড়ি, সেই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঐ সব পরমাণুকেন্দ্র স্বভাবত অস্থায়ী। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইউরেনিয়াম রেডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর পরমাণুর উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের পরমাণুকেন্দ্রে বহুসংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন আছে স্বল্পপরিসর স্থানে জমাট বেঁধে। এই কারণে সম্ভবত কেন্দ্রের ভিতরকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটতে পারে নি। ফলে পরমাণুকেন্দ্র ক্রমশ ভেঙে পরিশেষে স্থায়ী সীসক পরমাণুতে সাম্যাবস্থা লাভ করে।

তেজশক্তি ও তার দ্বৈতভাব

পূর্বেই বলা হয়েছে যে জড়পদার্থের সহযোগে সাধারণত আমরা শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করি। বস্তুত জড়পদার্থের উপর শক্তির ক্রিয়াই আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি, শক্তিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। কিন্তু সূর্য থেকে যখন আমরা তাপ ও আলোক পাই, তখন বলতে হয় জড়ের সংস্পর্শ ছাড়াও শক্তি বিরাজ করতে পারে। বেতারবার্তায় যে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার হয়, তার চলাচলেও কোন জড়-পদার্থের সংস্রব থাকে না। এই প্রকারের শক্তি যে জড়ধর্মহীন সর্বব্যাপী ঈথর বা ব্যোমের মধ্যে তরঙ্গের সৃজন ক'রে চলতে থাকে এও আমরা দেখেছি। শক্তির এই রূপকে আমরা নাম দিতে পারি তেজ। অণুপরমাণুর চঞ্চলতা ও কম্পন হতে এবং তাদের উপাদান ইলেকট্রনের কক্ষ হতে কক্ষান্তরে গমনের ফলে এই তেজ-শক্তির উদ্ভব হয়। এই সব কম্পন চারদিকে ঈথর-সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এই ঈথর-তরঙ্গ বা ঢেউ যখন আমাদের চোখের ও দেহের অণুপরমাণুতে এসে ঘা লাগায় তখন আমাদের আলোক ও তাপের অনুভূতি জন্মে। আমাদের চোখের বা দেহের অনুভূতিশক্তি সংকীর্ণ। তাই সকল শ্রেণীর ঈথর-তরঙ্গ বা তেজশক্তি

আমরা অনুভব করতে পারি না। তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বা কম্পনের সংখ্যা অনুসারে এদের শ্রেণীভাগ করা হয়। পরীক্ষায় দেখা যায় যে এক-একটি তেজ-তরঙ্গ এক ইঞ্চির বিশ লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ হতে আরম্ভ ক'রে পাঁচ মাইল (আকাশবাণীর বিদ্যুৎতরঙ্গ) অবধি দীর্ঘ হতে পারে। এই সব বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের ভিতর অতি অল্পসংখ্যকই আমরা আলোকরূপে অনুভব করি। এ থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক দৈর্ঘ্যের তেজ-তরঙ্গ আমরা তাপরূপে অনুভব করি; তারও অধিক দৈর্ঘ্যের তেজ-তরঙ্গের অস্তিত্বের খবর পাই আমরা বেতারবার্তার সাহায্যে। যে সব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্য হতে কম তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় ফোটোগ্রাফ-ফলকের সাহায্যে। শুধু চোখে আমরা মাত্র সাত রঙের আলোকতরঙ্গ অনুভব করতে পারি। সূর্যের সাদা আলোককে পুরু ত্রিপার্শ্ব কাচ (prism) বা বর্ণলিপিযন্ত্রের সাহায্যে (spectroscope) ভাঙলে পর-পর যে সাত রঙের ছটা বা বর্ণসপ্তক দেখা যায়, সেগুলি তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস ক্রমে এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তে সাজান থাকে— যথা, দৈর্ঘ্যের হ্রাসক্রমে লাল বা লোহিত, নারাঙ্গী, হলদে বা পীত, হরিৎ বা সবুজ, নীল, ঘননীল, বেগুনি। লাল প্রান্তের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হলে আমরা অদৃশ্য লালেতর বা লাল-উজানী (infra-red) তরঙ্গের তাপরশ্মি এবং পরিশেষে অতি দীর্ঘ বেতারবার্তা বা আকাশবাণীর তরঙ্গের (radio waves) খবর পাই। সেইরূপ বেগুনি প্রান্তের পর ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়; যেমন অতিবেগুনি আলো (ultra-violet), রঞ্জেন-রশ্মি, গামা-রশ্মি ও পরিশেষে সৃষ্টি বা মহাজাগতিক রশ্মির (cosmic rays) তরঙ্গ। লালেতর তরঙ্গসমূহকে আমরা তাপরশ্মিরূপে অনুভব করে থাকি।

তেজশক্তির এই সমগ্র মাপকাঠির ভিতর যে অংশটুকু আমরা চোখে অনুভব করি তা অতি সামান্য; $\frac{1}{40}$ ভাগ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এক কথায় বলা যায় আমরা তেজতরঙ্গবাহী ঈথর-সমুদ্রে ডুবে আছি; এবং এই সব তরঙ্গের মাত্র সামান্য কয়েকটি নির্দিষ্টসংখ্যক শ্রেণী আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ধরা দেয়।

সকল শ্রেণীর তরঙ্গ যদি আমাদের দৃষ্টিগোচর হত, তাহলে এই জড়জগতের চেহারা যেত একেবারে বদলে।

লাল হতে দীর্ঘতর যে সব তেজতরঙ্গ আছে, তাদের সৃষ্টি হয় অণুপরমাণুর বা ইলেক্‌ট্রনের কম্পনের ফলে। লাল বা লাল হতে হ্রস্বতর তেজতরঙ্গের সৃষ্টি হয় পরমাণুর ইলেক্‌ট্রনমণ্ডলীর কক্ষ-পরিবর্তনে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, পরমাণু-কেন্দ্রের চারদিকে ইলেক্‌ট্রন নির্দিষ্ট কক্ষে মণ্ডলীনৃত্যে ঘুরতে থাকে। এই সব ইলেক্‌ট্রন যখন কক্ষ হতে কক্ষান্তরে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যায়, তখনি এরা এই খাটো তরঙ্গের তেজশক্তি শোষণ বা বিকিরণ করে থাকে। এই তথ্য সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী বয়রের গবেষণার ফলে পাওয়া গেছে।

কক্ষ হতে কক্ষান্তরে ইলেক্‌ট্রনের এই যাতায়াত ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত রকমের। বিজ্ঞানী বয়র একে যে ভাবে চিত্রিত করেছেন তা আমাদের সাধারণ ধারণায় আসে না। ইলেক্‌ট্রন যখন এক চক্রপথ হতে অন্য চক্রপথে যায় তখন এই উভয় কক্ষের মধ্যবর্তী ব্যবধানের ভিতর দিয়ে তাকে চলাচল করতে হয় না। যে মুহূর্তে তার তিরোভাব হয় এক কক্ষে, ঠিক সে মুহূর্তেই সে দেখা দেয় অন্য কক্ষে। যেন এই উভয় কক্ষের মধ্যে দেশকালের কোন দূরত্ব ইলেক্‌ট্রনের পক্ষে নেই বললেই চলে। এরূপ অসাধারণ ঘটনার নমুনা আমাদের ব্যবহারিক জড়-জগতে মিলে না। এ যেন কতকটা মানসলোকের ব্যাপার, যাকে আমরা কথায় বলি 'মনসা মথুরাং ব্রজেৎ'। লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন বা নিউইয়র্ক হতে প্রত্যাগত কোন কলিকাতাবাসী ঐ সব দূর শহরে ফিরে যেতে পারেন তাঁর মনের রথে চড়ে— এতে লাগবে না তাঁর এক মুহূর্তও সময় বা তাঁকে যেতেও হবে না কলিকাতা এবং ঐ সব নগরীর মধ্যবর্তী দেশের উপর দিয়ে। এ হতে বলা যেতে পারে জড়ধর্মী ইলেক্‌ট্রনে যেন মন বা চিৎ-এর ধর্ম আছে প্রচ্ছন্ন হয়ে।

আমরা দেখেছি যে তরঙ্গাকারে চলাই হল তেজশক্তির বিশেষত্ব। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক তাপরশ্মির পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করলেন যে তাপশক্তির বিকিরণ ও শোষণ একটানা ধারাবাহিক ভাবে ঘটে না।

কোন বিশিষ্ট কম্পনের তাপতরঙ্গ কেবলমাত্র ঐ কম্পনসংখ্যার মাত্রার অনুযায়ী তাপশক্তির একক বা তার পূর্ণ গুণকরূপে বিকীর্ণ বা শোষিত হতে পারে। এতে দেখা যায় যে, শক্তির বিশিষ্ট ধর্ম ঢেউ তুলে চলা হলেও তাপরশ্মিকে তাপ-কণিকার সমষ্টিরূপে মনে করা যেতে পারে। এইরূপে জড়ের বিশিষ্ট ধর্ম, অণু-প্রকৃতি, তাপশক্তিতে বর্তমান রয়েছে দেখা যায়। আইনস্টাইন আলোকশক্তির বেলাতেও শক্তির এই দ্বৈতভাবের প্রমাণ করেছেন। পরবর্তীকালে মার্কিন বিজ্ঞানী কম্পটন তাঁর বিখ্যাত রঞ্জেন-রশ্মি সম্পর্কিত গবেষণায় (Compton Effect) প্রমাণ করেছেন যে জড়কণিকার মত এই সব শক্তি-কণিকারও ভরবেগ (momentum) এবং ভর (mass) আছে। কম্পটন এই সব তেজ বা শক্তি-কণিকার নাম দিয়েছেন ফোটন (Photon)। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তেজের শক্তিভাব হচ্ছে ঢেউ তুলে চলা, এবং তার জড়ভাব হচ্ছে অণুপ্রকৃতির অনুকরণ করা। এই উভয় ভাবে শক্তির ক্রিয়া বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। ফলে, নিউটনের শক্তিকণিকাবাদ নবজীবন লাভ করেছে বলা যায়। অবশ্য শক্তিকণিকা বা ফোটন বললে অণুপরমাণুর অনুরূপ কোন জড়পদার্থের কণিকার ধারণা করা ঠিক হবে না। একে নির্দিষ্ট কম্পনসংখ্যার তরঙ্গের গুচ্ছ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ শক্তিতরঙ্গ জলের ঢেউএর মত নিরন্তর একটানা চলে না; স্বতন্ত্র গুচ্ছ বা দল বেঁধে চলাচল করা হচ্ছে এদের স্বভাব।

জড়কণিকার একটি বিশিষ্ট ধর্ম হচ্ছে তার ভর (mass)। শক্তিকণিকা বা শক্তির তরঙ্গগুচ্ছেও জড়কণিকার এই বিশিষ্ট ধর্মের প্রকাশ দেখা যায়। বিভিন্ন কম্পনসংখ্যার তরঙ্গগুচ্ছ বা শক্তিকণিকার ভর বিভিন্ন। এই তথ্য পরীক্ষায় ও গণনায় ঠিক করা গেছে।

পূর্বে আমরা দেখেছি যে বিদ্যুৎশক্তি যেমন এক দিকে ইলেকট্রন পজিট্রন নামক বিপরীতধর্মী কণিকারূপে নিজকে প্রকাশ করে, সেইরূপ অন্য দিকে আবার আকাশবাণী ও বেতারবার্তার তরঙ্গরূপেও চলাচল করতে পারে। অতঃপর আমরা দেখতে পাব যে এই সব জড়ধর্মী ইলেকট্রন পজিট্রনও তরঙ্গের গুচ্ছবিশেষ।

জড়ের দ্বৈতভাব

পূর্বে বলা হয়েছে যে পরমাণুমাত্রই বিদ্যুৎকণিকায় গঠিত। বিপরীতধর্মী উভয় প্রকার বিদ্যুৎকণিকায়, পজিট্রন ও ইলেকট্রনে, সকল জড়ধর্মের নিদর্শন পাওয়া যায়। এদের স্বকীয় ভর আছে। আমরা আরও দেখেছি যে শক্তি তরঙ্গও জড়ের ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। মুক্ত তরঙ্গে ও সংঘ বেঁধে (কণিকারূপে)— এই উভয় ভাবে যদি শক্তির চলাচল সম্ভব হয়, তবে জড়কণিকাও যে তরঙ্গাকার ধারণ করতে পারে তা কিছুই অসম্ভব নয়। ফরাসী বিজ্ঞানী লুই দ্য ব্রগলিএই মতবাদ প্রথম প্রচার করেন। তিনি গণনায় দেখালেন যে যদি জড়কণিকা তরঙ্গসংঘের আকার ধারণ করে তবে তাদের ভরের সঙ্গে ঐ তরঙ্গের কম্পনসংখ্যার একটি সহজ সম্বন্ধ দেখা যাবে।

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে মার্কিন বিজ্ঞানী ডেভিসন ও গারমার লেগে গেলেন দ্য ব্রগলির এই মতের সত্যতা পরীক্ষার কাজে। তাঁরা বন্দুকের গুলির মত ইলেক্‌ট্রন-রশ্মি ছুঁড়ে পাঠালেন একটি ধাতুফলকের উপর। যখন এই সব ইলেকট্রন-রশ্মি ধাতুফলক হতে প্রতিফলিত হল, তখন দেখা গেল প্রতিফলিত ইলেকট্রন-রশ্মি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এমন একটি চিত্রের সৃষ্টি করল যা তরঙ্গধর্মী আলোক-রশ্মির প্রতিফলনের সম্পূর্ণ অনুরূপ। ইংরেজ বিজ্ঞানী জি. পি. টম্‌সন্‌ সোনার সূক্ষ্ম পাতের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রন-রশ্মি চালিয়ে ঐ একই চিত্র দেখতে পেলেন। এতে প্রমাণ হল জড়ধর্মী ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎকণিকা শক্তিতরঙ্গের সংঘ-বিশেষ। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে মার্কিন বিজ্ঞানী ডেম্প্‌স্টার এরূপ পরীক্ষার কাজে ইলেকট্রনের বদলে তার চেয়ে বহুগুণে ভারী প্রোটনের ব্যবহার করেন। ধাতুফলকের উপর প্রোটন ছুঁড়েও পাওয়া গেল একই ফল। সুতরাং সিদ্ধান্ত হল জড়কণিকার তরঙ্গপ্রকৃতি শুধু ইলেকট্রনে নয়, তার চেয়ে দুহাজার গুণ ভারী প্রোটনেও রয়েছে। শক্তিরশ্মিতে যেমন জড়ভাবের আরোপ করা যেতে পারে, জড়েও তেমন শক্তির বিশিষ্ট ধর্ম তরঙ্গপ্রকৃতির কল্পনা করা যায়।

অতএব হ্য ব্রগলির মতবাদানুসারে শক্তি ও জড়ে কোন ভেদ নেই। এরা একই আদিভূতের এপিঠ ওপিঠ মাত্র। ইলেকট্রন, প্রোটন ও ফোটন সবাই শক্তিকণিকারূপে আকাশবিন্দুর চারদিকে তরঙ্গরাজির ঘূর্ণিপাক।

সুবিখ্যাত অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী শ্রোডিংগার তাই তাঁর নবতম পরমাণুবাদে জড় স্বভাবকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পরমাণু ও তার উপাদান ইলেকট্রন প্রোটনকে শুধু তরঙ্গের সংঘ বা গুচ্ছরূপে চিত্রিত করেছেন।

অতএব বলা যেতে পারে, অণু এবং তরঙ্গ এই উভয়ভাবে চলছে সৃষ্টিরাজ্যে জড়ের প্রকাশ এবং ক্রিয়া।

জড় ও শক্তির পরস্পর রূপান্তর

পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে জড়ের বিশিষ্ট ধর্ম কণিকা-প্রকৃতি, এবং এও বলা গেছে যে তেজশক্তিতেও এই কণিকার ধর্ম আরোপ করা যেতে পারে। আমরা আরও দেখেছি যে জড়পরমাণু বিদ্যুৎকণিকায় গঠিত এবং এই বিদ্যুৎ-কণিকাও আবার শক্তি-তরঙ্গের ঘূর্ণিপাকরূপে অবস্থান করতে পারে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে পরম বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত 'আপেক্ষিক তত্ত্ব' (Theory of Relativity) প্রচার করেন। এই তত্ত্বের একটি মূল ধারামতে শক্তি ও জড়ের পরস্পর রূপান্তর ঘটতে পারে। যখনই কোন জড়পদার্থ তেজশক্তির বিকিরণ বা শোষণ করে, এই প্রকারের রূপান্তর তখনই দেখা যায়। পূর্বে যে সব পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে তাতে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের এই মূলধারা এখন বিনা আপত্তিতে মানতে হয়। কি পরিমাণ জড়পদার্থের রূপান্তরে কি পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হতে পারে তা গণনার সাহায্যে আইনস্টাইন বের করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে অতি সামান্য পরিমাণ জড়পদার্থের ধ্বংসে বিপুল পরিমাণ শক্তির সৃজন করা যেতে পারে। একটি মটরের আকারের কয়লার টুকরোকে যদি শক্তিতে পরিণত করা যায়, তবে ওর সাহায্যে একটি

বড় রকমের যাত্রী-জাহাজকে চালান যাবে লণ্ডন থেকে নিউইয়র্কে। যদি এক পাউণ্ড ওজনের বালি বা মাটিকে শক্তিতে পরিণত করে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে তা দশলক্ষ টন ডিনামাইটের সমান প্রবল হবে ধ্বংসশক্তিতে। কিন্তু এই-প্রকারের সম্পূর্ণ রূপান্তর পৃথিবীর পরীক্ষাগারে সম্ভব নয়। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রপিণ্ডের মধ্যে যেখানে তাপমাত্রা প্রায় ২ কোটি ডিগ্রী, সে সব স্থানে এইরূপ পুরোপুরি রূপান্তরের সম্ভাবনা পণ্ডিতেরা কল্পনা করেন।

সম্প্রতি এইপ্রকার রূপান্তরের প্রমাণ পাওয়া গেছে পরীক্ষায়। মার্কিন বিজ্ঞানী এণ্ডারসন, ফরাসী মহিলা-বিজ্ঞানী কুরী (মাদাম কুরীর কন্যা) ও তাঁর স্বামী জোলিও এবং জার্মান মহিলা-বিজ্ঞানী মাইটনার গামা-রশ্মিকে গুরুভার পদার্থের (যথা সীসক) মধ্যে ছুঁড়ে তা থেকে যুগল বিদ্যুৎকণিকার (ইলেকট্রন ও পজিট্রন) উৎপত্তি প্রত্যক্ষ করেছেন। আমরা দেখেছি বিদ্যুৎকণার ভর আছে, সুতরাং তারা জড়ধর্মী। অতএব এই পরীক্ষায় আমরা তেজরশ্মির জড়ে পরিণতির বা শক্তি হতে জড়ের জন্মের নমুনা পাই। আবার জড়কণিকার ধ্বংসে যে শক্তির উৎপত্তি ঘটতে পারে তাও ফরাসী বিজ্ঞানী জোলিও পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করেছেন। যখন কোন জড়পদার্থের ভিতর দিয়ে হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎকণিকা বা পজিট্রনধারা প্রেরণ করা হয়, তখন ঐ জড়পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ইলেকট্রনের সঙ্গে সংঘাতে এই দুই বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎকণিকা যায় মিলে। তাতে তাদের পরস্পরের নির্বাণ ঘটে ; এবং তার ফলে হয় ফোটন বা গামা-রশ্মির উৎপত্তি। সুতরাং বলা যায় যে, এ প্রক্রিয়ায় আমরা জড়ের মৃত্যুতে শক্তির জন্মের খবর পাই।

জড়ের ধ্বংসে শক্তির উৎপত্তির অন্যবিধ প্রমাণও বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেছেন। এই সব প্রমাণকে অবশ্য প্রত্যক্ষ বা মুখ্য প্রমাণ বলা যায় না। পূর্বে বলা হয়েছে যে যাবতীয় মৌলিক পদার্থের পরমাণুকেন্দ্র গঠিত হয়েছে প্রোটন ও নিউট্রনের সমবায়ে। হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণুর ওজন হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর ওজনের প্রায় চারগুণ। অবশ্য ঠিক চারগুণ বলা যায় না, তার চেয়ে খুব সামান্য কম। একটি হিলিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন রয়েছে।

আমরা দেখেছি যে নিউট্রন ও হাইড্রোজেন পরমাণু ওজনে সমান। এই অবস্থায় হিলিয়াম-পরমাণুর ওজন হাইড্রোজেন-পরমাণুর ওজনের ঠিক চারগুণ হওয়া উচিত ছিল। এই তফাতটুকুর কারণ কি? বিজ্ঞানীদের মতে হিলিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রে যখন প্রোটন ও নিউট্রন অতি স্বল্পপরিসর স্থানে জড়ীভূত হয়, তখন পরস্পরের আকর্ষণের ফলে তাদের স্বীয় বস্তুপরিমাণের অতি সামান্য অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে, তেজরূপে হয় এর বিকিরণ।

পূর্বে বলা হয়েছে যে একটি বালি প্রমাণ জড়কণিকার ধ্বংসেও অপরিমেয় শক্তির উদ্ভব ঘটতে পারে। বিজ্ঞানীদের এ সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত প্রমাণ হয়ে গেছে বিগত মহাযুদ্ধে, আণবিক বোমার আবিষ্কারে। বিজ্ঞানী ফার্মি এবং বিদুষী কুরী পরীক্ষার ফলে প্রত্যক্ষ করেন যে নিউট্রন-কণিকার আঘাতে ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রবস্তুর এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে অজানা নূতন মৌলিক পদার্থের কৃত্রিম সৃষ্টির সম্ভাবনার প্রথম আভাস তাঁরা দেখতে পান। জার্মান রাসায়নিক হানের পরীক্ষায় কিন্তু প্রমাণ হল যে এ অবস্থায় ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রবস্তুটি ভেঙ্গে দুই বা বহু ক্ষুদ্রতর পরিচিত মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রবস্তুতে পরিণত হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ শক্তির উদ্ভব ঘটে। ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রবস্তুর ভর এবং নিউট্রনের ভরের যোগফলের সঙ্গে উদ্ভূত কেন্দ্রবস্তু দুটির ভরের যোগফল তুলনা করলে দেখা যায় যে শেষোক্ত যোগফলের পরিমাণ হয় পূর্বোক্ত যোগফল হতে কিছু কম। অতএব প্রমাণ হল যে, বস্তুভারের এ হ্রাস বা কমতি ঘটেছে শক্তিতে তার রূপান্তর হয়ে। এ পরীক্ষাই হল আণবিক বোমার ভিত্তি। ইউরেনিয়াম ও নিউট্রনের সংঘাতে আবার নূতন নূতন অজানা মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। এ সবার মধ্যে একটির নাম হচ্ছে প্লুটোনিয়াম। প্লুটোনিয়ামের কেন্দ্রবস্তুকেও সহজে নিউট্রনের আঘাতে ভেঙ্গে দ্বিখণ্ডিত করা যায়। এতেও বিস্তর শক্তির উদ্ভব হয়। এ প্লুটোনিয়ামই হচ্ছে এখন আণবিক বোমার উপাদান। পাউণ্ডখানেক ওজনের একটি মাত্র

আণবিক বোমা যে কি প্রচণ্ড শক্তিশালী তার প্রমাণ হয়ে গেছে ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট তারিখে সকালবেলা ৮ ঘটিকায়, জাপানে হিরোসিমা সহরের উপর যখন তাকে নিক্ষেপ করা হয়। হাজার হাজার নরনারীর মৃতদেহ নিয়ে সমগ্র নগরীটির ধ্বংসাবশেষ এক মুহূর্ত্তে দেখা দিল বিজ্ঞানের এ নিদারুণ সত্যের মূর্তিমান প্রতীকরূপে।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এ হ'তেও ভীষণতর হাইড্রোজেন বোমার সৃষ্টির কাজে গেছেন লেগে। গুরুভার হাইড্রোজেন-পরমাণুর ওজন সাধারণ হাইড্রোজেন-পরমাণুর দ্বিগুণ। এরূপ দুটি গুরুভার হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর যদি সংযোগ ঘটে, তা হলে একটি হিলিয়ামের কেন্দ্রবস্তুর সৃষ্টি হবে। এ ক্ষেত্রেও গণনায় দেখা যায় যে বস্তুসমষ্টির কথঞ্চিৎ হ্রাস ঘটে; তারই বিনিময়ে হবে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব এবং বিকিরণ।

বিংশ শতাব্দীর এই আবিষ্কারের ফলে শক্তি ও জড়ের স্বাতন্ত্র্য গেছে ঘুচে; এবং তাদের এই একীকরণের দরুন উনবিংশ শতাব্দীর জড়ের নিত্যতাবাদ ও শক্তির নিত্যতাবাদ বর্তমানে জড়-শক্তির নিত্যতাবাদে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ এই বিশ্বজগতের জড় এবং শক্তির মোট যোগফল চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কখনো এর কোন ব্যতিক্রম ঘটতে পারে না। কদাচ কোন কারণে জড়ের বা শক্তির পরিমাণের কমতি ঘটলে, ঠিক তার সমানদরের শক্তির বা জড়ের পরিমাণের যথাক্রমে বাড়তি ঘটে।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বিশ্বজগতের এই দুই মূল উপাদান, শক্তি এবং জড়, একই উপাদানের রূপান্তরবিশেষ। উভয়কেই তরঙ্গ বা কম্পন রূপে কল্পনা করা যেতে পারে। এই সব তরঙ্গ যখন কোন স্থানে কুণ্ডলী পাকিয়ে আবর্তের সৃজন ক'রে আটকে পড়ে, তখনই এদের জড়ধর্মের প্রকাশ পায়। যখন আবার ঋজুরেখ গতিতে এদের প্রবাহ চলে, তখন তারা দেখা দেয় তেজ বা আলোক-রূপে। এই দুই জাতীয় তরঙ্গরাজির আবার পরস্পর রূপান্তর ঘটছে। যে সব তরঙ্গশ্রেণী চক্রপথে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে, তারা সময়-বিশেষে নিজেকে ঐ ঘূর্ণিপাকের

কারাগার হতে মুক্ত করে সোজাপথে ছুটে পালায়। একেই পণ্ডিতেরা জড়ের মৃত্যু ও শক্তির বা তেজের জন্ম রূপে কল্পনা করেছেন।

এখন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, এই তরঙ্গ কিসের? বিজ্ঞানী তার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না। মোটের উপর জড় এবং শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা যে জ্ঞান লাভ করেছেন তার সবই পরীক্ষালব্ধ। তাঁদের এ জ্ঞান তাঁরা প্রকাশ করেছেন শুধু অঙ্কশাস্ত্রের সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে। এতে জড় বা শক্তির কোন বাস্তব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্র আমাদের মনে অঙ্কিত হতে পারে না। আমাদের সাধারণ জ্ঞানে আমরা যাকে জড় বস্তু বা শক্তি বলে বর্ণনা করি, বিজ্ঞানের মতে তা হচ্ছে শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়ের কারসাজি ও মনের ভ্রান্তি।

মহাজাগতিক রশ্মি : জড়ের সৃষ্টি ও বিলয়

মাত্র কয়েক বৎসর হল বিজ্ঞানীরা একপ্রকার নূতন প্রচণ্ড শক্তিশালী তেজ-রশ্মির আবিষ্কার করেছেন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বহিঃপ্রদেশ হতে অবারিত ধারায় এদের বর্ষণ চলছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন নাক্ষত্রিক জগৎ হতে এদের আমদানি। তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'কস্‌মিক' বা মহাজাগতিক রশ্মি। এই সব রশ্মির শক্তি এতই প্রখর যে অনায়াসে ১৫।১৬ ফুট পুরু সীসক ভেদ করে এরা চলে যেতে পারে। ৬০০।৭০০ ফুট জলের তলায়ও এদের চলাচল দেখা যায়। জল স্থল অন্তরীক্ষে সর্বত্রই এদের অবাধ গতি। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে এই সব রশ্মি তরঙ্গধর্মী এবং এদের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অত্যন্ত খাটো; সুতরাং কম্পনসংখ্যাও ঐ অনুপাতে খুব বেশী। হিসাবে দেখা যায় এদের কম্পনসংখ্যা গামা-রশ্মির কম্পনসংখ্যার প্রায় ৫০ গুণ। এরা আসছে সুদূর নক্ষত্রলোক হতে; কতদূর যে তার ইয়ত্তা নেই। কি যে বার্তা এরা ঐ সুদূর দেশ থেকে বহন করে আনছে তার সন্ধানে বিজ্ঞানীরা এখন ব্যস্ত। যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এরা প্রবেশ করে তখন এদের চলাচলের পথে বায়ুর অণুপরমাণু পড়লে তারা অনেক সময়ে

ভেঙে ইলেকট্রন, পজিট্রন, প্রোটন ও মেসন (গুরুভার ইলেকট্রন) প্রভৃতি বিদ্যুৎ ও জড়কণার সৃজন করে। এই সব রশ্মির প্রকৃত স্বরূপ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনো পণ্ডিতেরা একমত হতে পারেন নি। এই বিষয়ে বহু গবেষণা ও পরীক্ষা চলছে।

কারো কারো মতে এরা অত্যন্ত খাটো দৈর্ঘ্যের ফোটন বা তরঙ্গকম্পন। আবার কেউ কেউ মনে করেন এরা নিজেই ক্ষিপ্রগামী ইলেকট্রন, প্রোটন বা নিউট্রনের সমষ্টি।

এদের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বিবিধ মত প্রচলিত আছে। ইংরেজ জ্যোতিবিদ জীন্‌স প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে আমাদের সূর্য ও সুদূর নক্ষত্রপিণ্ডে প্রচণ্ড উত্তাপে জড়পরমাণু হতে অবিরত ইলেকট্রন ও প্রোটন বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে পড়ছে। এই সব প্রোটন ও ইলেকট্রন পরমাণুর ভিতরকার শৃঙ্খলার বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে যখন ছুটোছুটি করতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে সংঘাত ঘটে এবং বিপরীত বিদ্যুদ্ধর্মের প্রচণ্ড আকর্ষণে তারা যায় মিলে। এই সংযোগের ফলে প্রোটনের বিলয় এবং শক্তির উদ্ভব হয়। এই শক্তিই মহাজাগতিক রশ্মিরূপে চারদিকে বিকীর্ণ হতে থাকে। এক কথায় বলা যায় এই বস্তুজগৎ চলছে নিরন্তর ধ্বংসের পথে, প্রতিনিয়ত জড়ের রূপান্তর ঘটছে শক্তিতে। এই রূপান্তর একমুখী, যা দৃশ্যমান তার বিলয় হচ্ছে অদৃশ্যমানে। বিশ্বজগৎ তার বস্তুপুঞ্জ নিয়ে যেন ছুটে চলেছে প্রলয়ের দিকে, যেখানে থাকবে শুধু এক মহাশক্তির বা জ্যোতির ব্যাপক উদ্দাম লীলা। তাপগতির নিয়মও (Law of Thermodynamics) বিশ্বজগতের এই পরিণাম নির্দেশ করে।

তাপ-চলাচলের পরীক্ষা হতে বহুকাল পূর্বে বিজ্ঞানীরা একটি বিশিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার করেছেন। এ পর্যন্ত এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়নি। এ নিয়মানুসারে যে কোন বস্তুসংহতি— যথা অণুপরমাণু বা তাদের উপাদান ইলেকট্রন প্রোটন প্রভৃতি— সতত শৃঙ্খলার রাজ্য হতে বিশৃঙ্খলার পথে অগ্রসর হচ্ছে। কোন বাঁধন মেনে চলা এরা পছন্দ করে না। প্রত্যেকে চায়

মুক্তি, চায় স্বাধীনতা। এই হল এদের ধর্ম বা স্বভাব। কোন শৃঙ্খলার সংস্থিতিতে এদের বাঁধতে হলে চাই বিপরীত শক্তির শাসন। অণুপরমাণু-জগতে এই শাসনের শক্তি জোগায় বিপরীতধর্মী বিদ্যুতের আকর্ষণ। মানুষের সমাজেও এই নীতির অনুশাসন আমরা দেখতে পাই। প্রত্যেক মানুষই চায় স্বাধীনতা, চায় বাঁধন কাটতে। মানুষের এই প্রকৃতিকে ঠেকিয়ে রাখে তাদের পরস্পরের স্নেহের ও প্রীতির টান। এতেই সমাজবিধান টিকে আছে। এই প্রীতির টানে শৈথিল্য ঘটলে সমাজ যায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে। তখন তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাইরে থেকে চাপাতে হয় রাষ্ট্রের শাসন।

অন্য দিকে মার্কিন পদার্থবিদ্ মিলিকান প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে জড়ের এরূপ বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার সৃষ্টিকার্যও চলেছে সমান জোরে। অর্থাৎ জড় ও শক্তির এই রূপান্তর পারস্পরিক। মিলিকান তাঁর পরীক্ষার ফলে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা এই : সূর্য ও অগণিত নক্ষত্রমণ্ডলী হতে অনবরত অণুপরমাণুর ধ্বংসের ফলে যে শক্তির বিকিরণ ঘটে, তা নক্ষত্ররাজির আড়ালে বিপুল শূন্যাকাশের চরম শৈত্যে তরঙ্গসংঘের কুণ্ডলী পাকিয়ে পুনরায় ইলেকট্রন প্রোটনরূপ বিদ্যুৎ ও জড়-কণিকার সৃষ্টি করে। এই প্রোটন ও ইলেকট্রন হতে আবার হিলিয়াম, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস ও অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পরমাণু গঠিত হচ্ছে। আমরা পূর্বে দেখেছি যে প্রোটন, ইলেকট্রন বা নিউট্রন হতে এই গুরুভার পরমাণুসমূহের সৃষ্টিকালে প্রোটনের ওজনের কিছুটা হ্রাস হয়। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার এই ক্ষয়প্রাপ্ত বস্তুভারই মহাজাগতিক রশ্মিরূপে দেখা দেয়। সৃষ্টি এবং বিলয়ের এই বিপরীতমুখী প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে বিশ্বজগতের সাম্য ও স্থিতি।

অল্পদিন হল বিবিধ পরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানীরা এখন সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই মহাজাগতিক রশ্মি প্রধানত প্রোটনের সমষ্টি। এদের গতিবেগ এত দ্রুত যে সহজে প্রোটন বলে এদের চেনা যায় না। এই সব প্রোটন কি অণুপরমাণুর ধ্বংসাবশেষ, না সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রথম সোপান, এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় নি।

তবে এরা যে সুদূর হতে কোন নিগূঢ় সংবাদের সংকেত বহন করে নিয়ে আসছে আমাদের কাছে, তা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

আধুনিক গবেষণার ফলে জ্যোতির্বিদেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রদেহে প্রচণ্ডতাপে হাইড্রোজেনের কেন্দ্রবস্তু হতে অনবরত হিলিয়ামের কেন্দ্রবস্তুর সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে যে শক্তির উৎপত্তি ঘটে তা হতেই সূর্য এবং নক্ষত্রদেহের তাপ থাকে একপ্রকার অক্ষুণ্ণ হয়ে। নতুবা, অবিরাম তাপ ও আলোক বিকিরণ করে বহুকাল আগেই আমাদের সূর্য যেত নিভে, এবং তার ফলে ধরাপৃষ্ঠে জীবনের সকল চিহ্ন যেত বিলুপ্ত হয়ে, ও প্রচণ্ড শৈত্যে পৃথিবীর উপর কঠিন বরফের স্তর যেত জমে। বহু নক্ষত্রে যখন তাদের দেহের সমস্ত হাইড্রোজেন কালক্রমে হিলিয়ামে পরিণত হয়ে যায়, তখন তাদের চেহারা এবং আয়তন যায় বদলে।

বিজ্ঞানীরা আরো কল্পনা করেন যে ছায়াপথের অন্তরালে বিপুলাকাশে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর শক্তিকণা বা বিশ্বের অন্তিমসত্তা হতে হাইড্রোজেনের কেন্দ্রবস্তুর সৃষ্টি-প্রক্রিয়া চলেছে অবিরাম অনন্তকাল ধরে, এবং তা হতেই কালক্রমে গড়ে উঠছে নীহারিকা, ছায়াপথ ও অগণিত জ্যোতিষ্কাদি। পণ্ডিতেরা গণনায় স্থির করেছেন যে, প্রতি সেকেণ্ডে দৃশ্যমান বিশ্বজগতে হাজার কোটি কোটি কোটি কোটি টন হিসাবে হাইড্রোজেন-পরমাণুর সৃষ্টি হচ্ছে। সংখ্যাটি দেখতে খুব বিরাট বটে, কিন্তু অনন্ত বিশ্বের তুলনায় একপ্রকার নগণ্য। কেননা, এ সৃষ্টির গতি এত মন্থর যে, কোন বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষার দ্বারা একে ধরা যায় না। দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপারটি সহজে বোঝান যেতে পারে। কলিকাতায় গভর্নরের বাড়ী যতখানি দেশ অধিকার করে আছে, সে পরিমাণ আয়তন আকাশে যদি বছরে একটি করে হাইড্রোজেন-পরমাণুর সৃষ্টি হয়, তবেই সারা বিশ্বে প্রতি সেকেণ্ডে উপরোক্ত ওজনের হাইড্রোজেন গ্যাসের উদ্ভব সম্ভব হতে পারে। এ বিরামহীন সৃষ্টি-প্রক্রিয়া চলছে বলেই বিশ্বের অস্তিত্ব আছে টিকে ; নতুবা বিশ্বজগত ছুটে চলত প্রলয়ের বা নির্বাণের পথে।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, যদি হাইড্রোজেন পরমাণু হতেই এ জড় জগতের অবিরাম সৃষ্টি হচ্ছে, তবে কি বিশ্বজগৎ ক্রমশই বেড়ে চলেছে? বস্তুত এরূপ প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। এর আলোচনা আমরা পরে করব। আরো একটি গুরুতর প্রশ্ন হচ্ছে—সৃষ্টির প্রাক্কালে হাইড্রোজেনের যখন উৎপত্তি হয়নি, তখন বিশ্বের অবস্থা কি ছিল? এর উত্তরে বলতে হয় সৃষ্টির প্রাক্কালে সকল আকাশ এবং দেশ জুড়ে ছিল এক নিরাকার, নিরবচ্ছিন্ন, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, নিশ্চল, নিত্য, অব্যক্ত, অনাদি এবং অনন্ত শক্তি বা কারণ সত্তা। এরূপ সত্তাকেই সাংখ্য পাতঞ্জলে বলা হয়েছে— প্রকৃতি বা বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ।

কবে কোন কল্পনাতীত সুদূর কালে এ আদি-অন্তহীন, সনাতন বিশ্বসত্তার ব্যাপ্তির মাঝে কোন অজ্ঞেয় কারণে সৃষ্টির প্রেরণা প্রথমে জেগে উঠেছিল, সে দিনক্ষণের ঠিকানা হয়ত মিলবে না। তবে জ্যোতির্বিদদের গণনায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমরা যে ছায়াপথের অধিবাসী তার সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে। আসলে, সৃষ্টির কোন প্রাক্কাল বা পূর্বাবস্থা হয়ত নাই। সৃষ্টি এবং বিলয় চলেছে সমানতালে বিরামহীন গতিতে অনাদি অনন্তকাল ধরে।

দেশ ও কাল

বিজ্ঞানী তাঁর যাবতীয় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করেন দেশ এবং কালের কাঠামোর মধ্যে। কারণ দেশ এবং কালের মধ্যে বিরাজ করছে সকল বস্তু এবং শক্তি। তাই এই দেশ এবং কালের প্রকৃত স্বরূপ কি, এই প্রশ্ন সহজেই মনে জাগে।

বিশ্বজগৎকে তিন ভাগ করে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করেছেন। অণুপরমাণুরূপ সূক্ষ্ম জগৎ,ব্যবহারিক জগৎ এবং বিশাল নাক্ষত্রিক জগৎ। অণুপরমাণুর সূক্ষ্ম জগৎ আমাদের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সম্পূর্ণ বাইরে। এর অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞানীরা করেছেন বিবিধ যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনা। বিশাল নাক্ষত্রিক জগতেরও আমরা ধারণা

করতে পারি না। ঊর্ধ্বাকাশে চন্দ্র সূর্য গ্রহাদি ও অগণিত নক্ষত্র এবং নীহারিকার যে সমাবেশ দেখা যায়, তাদের আয়তন, তাপমাত্রা ও পরস্পরের দূরত্ব সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ ধারণা আমাদের বোধের বা অনুভূতির অতীত। বিজ্ঞানী তাই দূরবীন, বর্ণলিপিযন্ত্র ও ফোটোগ্রাফের জাল ফেলে এই বিশাল জগতের খবর টেনে এনেছেন তাঁদের বুদ্ধিবিচারের গণ্ডির মধ্যে। পৃথিবী থেকে নক্ষত্রমণ্ডলীর দূরত্ব এত বেশী যে, আমাদের প্রচলিত মাইল বা ক্রোশের পরিমাপে প্রকাশ করতে হলে যে-কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার পশ্চাতে এত শূন্য বসাতে হবে যে তা বইএর পাতার পংক্তিতে ধরবে না। তাই পণ্ডিতেরা এই বিশাল দূরত্ব জ্ঞাপন করবার জন্যে বানিয়েছেন এক নূতন মাপকাঠি। তার একক হচ্ছে, এক আলোকবৎসর—অর্থাৎ ততখানি পথ যা অতিক্রম করতে আলোকের লাগে এক বছর সময়। আমরা দেখেছি আলোকের গতি হচ্ছে সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। অতএব এক আলোক-বৎসর বলতে যে দূরত্ব বুঝায় তা চলতি হিসাবে হবে প্রায় পাঁচ লক্ষ আশি হাজার কোটি মাইল। এই সব নক্ষত্র ও নীহারিকা এত দূরে আছে যে তাদের আলো আমাদের চোখে এসে পৌছতে যায় অনেক বছর কেটে। কাজেই এই মুহূর্তে যখন আমরা কোন নক্ষত্রকে দেখছি মনে করি তখন যে আলোক আমাদের চোখে পড়ছে, তা ঐ নক্ষত্রদেহ হতে যাত্রা করেছিল হয়ত বহু বৎসর আগে। অর্থাৎ নক্ষত্রের দূরত্ব যদি দশ আলো-বছর হয়, তবে এই মুহূর্তে আমরা যা দেখছি তা তার দশ বছর আগেকার চেহারা। প্রকৃতপক্ষে হয়ত এই মুহূর্তে তার সংস্থান গেছে বহু কোটি মাইল সরে। এমনও হ'তে পারে যে তার অস্তিত্বও গেছে এখন বিলোপ হয়ে। যে সব নক্ষত্র আমরা দেখি মনে করি, তারা সব হচ্ছে এখনকার নক্ষত্রের প্রেতাত্মা। নীহারিকাগুলি আছে আরো দূরে—প্রায় ২০।৩০ কোটি আলো-বছরের পথে। এরূপ যে কত কোটি কোটি নক্ষত্র ও নীহারিকা রয়েছে তার ইয়ত্তা করা সহজ নয়। সূর্যও একটি নক্ষত্র। তা আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটে বলে বড় দেখায়। পরস্পরের দূরত্বের মত এদের আয়তনও বিশাল। সূর্যের ব্যাস হচ্ছে ৮ লক্ষ ৬৬

হাজার মাইল। তার বহিঃপ্রদেশ বা পৃষ্ঠভাগ পৃথিবীর পৃষ্ঠের ১২,০০০ গুণ বড়। সব নক্ষত্রের আয়তন সমান নয়। ক্ষুদ্রতম নক্ষত্র যা জানা গেছে তার আয়তন পৃথিবীর আয়তন থেকে বেশী বড় নয়। আবার এমন অতিকায় নক্ষত্রও আছে যার দেহের মধ্যে কোটি কোটি সূর্যকে পুরে রাখা যায়। সূর্য রয়েছে তার সঙ্গী ছোট গ্রহদল নিয়ে আরো বহু নক্ষত্রের মধ্যে একটি মণ্ডলীর সৃষ্টি করে। এর আভ্যন্তরীণ নক্ষত্রগুলির পরস্পরের দূরত্ব প্রায় চার হতে আট আলো-বছরের পথে। কতকগুলি মটর যদি ১৫০ মাইল দূরে দূরে সাজান হয় তবে এই নক্ষত্র-মণ্ডলীর নক্ষত্রসমূহের সংস্থিতি ও পরস্পর দূরত্বের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

এরূপ প্রায় একশত নক্ষত্রমণ্ডলী মিলে একটি নক্ষত্রজগতের সৃষ্টি করেছে। এই নক্ষত্রজগতের কোন এক মণ্ডলীপ্রদেশের জনৈক অধিবাসী হচ্ছে আমাদের সূর্য ও তার গ্রহপরিবার। এ সব নক্ষত্রমণ্ডলী হতে পৃথিবীতে আলো আসতে তাদের দূরত্ব অনুযায়ী প্রায় ১৯ হাজার বছর হতে এমন কি প্রায় ১ লক্ষ ৮৫ হাজার বছর অবধি কেটে যেতে পারে। অর্থাৎ এ সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলীকে আমরা যে আলোতে দেখতে পাই, তা তাদের দেহ থেকে যাত্রা করেছে সভ্যতার পূর্বযুগে। একটি নক্ষত্রলণ্ডলীতে বহু লক্ষ তারার সমাবেশ। মণ্ডলীর কেন্দ্রে তারার বসতি ঘন, বাইরের দিকে অপেক্ষাকৃত কম। মোটের উপর সকল মণ্ডলীতে মিলে প্রায় ১৫০ কোটি তারার ঠিকানা পাওয়া গেছে। আমরা আকাশে যে ছায়াপথ দেখি তা এই সব তারামণ্ডলীর শেষ সীমানা এবং আমাদের নক্ষত্রজগতের সীমান্ত। এই ছায়াপথের বাইরে নক্ষত্রজগতের পরপারে আরও বহুদূরে রয়েছে নীহারিকার দল। পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব প্রায় ৯ লক্ষ হতে ১৪ কোটি আলো-বছরের পথ। সুতরাং আমাদের সব চেয়ে নিকট প্রতিবেশী যে নীহারিকা তার যে আলো এখন পৃথিবীতে আসছে তা যাত্রা করেছিল মানুষের আবির্ভাবের আগে। এই সব নীহারিকাকে অগণিত নক্ষত্রের সমষ্টি বলা যেতে পারে। দূরবীনযোগে প্রায় ২০ লক্ষ নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের প্রত্যেকটিতে আবার ২০০ কোটি তারা বা সূর্য রয়েছে। দূরবীনে যাদের দেখা যায় নি এমন আরও কত

যে নক্ষত্র রয়েছে তা বলা কঠিন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মোট নক্ষত্রের সংখ্যা কত, কোন বিজ্ঞানীর মতে তার একটি সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বর্ষার দিনে কলিকাতা নগরীতে যদি ২৪ ঘণ্টা মুষলধারে বৃষ্টি হয়, তবে সমস্তদিনে যতগুলি বৃষ্টির ফোঁটা শহরের উপর পড়বে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তারার সংখ্যাও প্রায় ততটা। বিভিন্ন নক্ষত্রের বস্তুগুরুত্বের মধ্যে খুব বিশেষ তফাত দেখা যায় না। সূর্যের গুরুত্ব জলের ১½ গুণ, কোন কোন নক্ষত্ররে গুরুত্ব সূর্যের গুরুত্বের ৫।৬ গুণ বেশী; কোনটার বা ঐ পরিমাণে কম। অবশ্য খুব অল্প কয়েকটি নক্ষত্রের বস্তুগুরুত্ব সূর্যের বস্তুগুরুত্ব থেকে অনেক তফাত। এদের মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা হালকা (আর্দ্রা) তার গুরুত্ব জলের গুরুত্বের ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ; যেটি সব চেয়ে ভারী (লুব্ধকের সহচর) তার গুরুত্ব জলের গুরুত্বের ৬০ হাজার গুণ বেশী। নক্ষত্রমাত্রই সূর্যের মত প্রদীপ্ত বাষ্পপিণ্ড। সমস্ত নক্ষত্রজগৎ ও নীহারিকা তাদের প্রত্যেক নক্ষত্র-অধিবাসীকে নিয়ে অনবরত এক কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে—সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে যেমন গ্রহাদি ঘোরে। আপন গতিবেগ ও পরস্পরের মধ্যে মহাকর্ষের দরুন বিশাল সৃষ্টিরাজ্যে তাদের শৃঙ্খলা বজায় আছে; ছিটকে গিয়ে পরস্পরের ঠোকাঠুকি ঘটে না। আমরা পূর্বে দেখেছি যে পরমাণুরাজ্যেও এরূপ শৃঙ্খলা অব্যাহত রয়েছে ইলেক্‌ট্রনের গতিবেগ ও ইলেক্‌ট্রন-প্রোটনের মধ্যে আকর্ষণের দরুন। অবশ্য ইলেক্‌ট্রন-প্রোটনে যে আকর্ষণ তা বৈদ্যুতিক, মহাকর্ষের দরুন নয়।

অতএব দেখা যায়, ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন ও পরমাণু হতে আরম্ভ ক'রে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র, এমন কি সমস্ত বহির্জগৎ, সর্বদাই চঞ্চল ও গতিশীল। ফলে সবাই ঘুরছে এক বিশ্বকেন্দ্রের চতুর্দিকে। 'কেন' যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তবে বিজ্ঞান তার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবে না। মেনে নিতে হবে এই চঞ্চলতাই জড়ের ধর্ম।

বিজ্ঞানীরা কল্পনা করেন যে সৃষ্টির গোড়ায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুপদার্থ ও সমস্ত শক্তিতে মিলে একটা প্রদীপ্ত চঞ্চল গ্যাস বা বাষ্প ছিল ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত

হয়ে। মহাকর্ষের টানে এই বাষ্প-ব্রহ্মাণ্ডের স্থানে স্থানে বাষ্পপরমাণুর ভিড় জমতে লাগল। এরই পরে গড়ে উঠল নীহারিকা, এই সব নীহারিকা হতে ক্রমশ নক্ষত্ররাজির হল সৃষ্টি। আমাদের সূর্যরূপী নক্ষত্রের দেহ হতে পরে জন্মাল পৃথিবী ও গ্রহ-উপগ্রহাদি। অনেক নীহারিকা আছে যাদের বাষ্পের কুণ্ডলী এখনও সম্পূর্ণ জমে ওঠে নি। তাই এদের কুণ্ডলী-নীহারিকা (Spiral Nebulæ) বলা হয়।

এই বিশাল নক্ষত্রজগৎ পর্যবেক্ষণ করে পণ্ডিতেরা দেশ ও কালের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেছেন আমরা এখন তারই আলোচনা করব।

পরমবিজ্ঞানী নিউটন (১৬৪২-১৭২৭খ্রী) তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের পথে অগ্রসর হয়ে গতিশীল পদার্থের রীতিনীতি ও মহাকর্ষের আবিষ্কার করেন। পৃথিবী ও সৌরজগতের যাবতীয় ঘটনার সন্তোষজনক কারণ এতে নির্ধারিত হল। এরই ফলে হল বলবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। আকাশপথে গ্রহাদির গতিবিধি সম্বন্ধে জ্ঞান হয়ে গেল সহজ ও সরল। নিউটনের পদ্ধতি-মতে গণনা ক'রে আকাশে গ্রহ-উপগ্রহদের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের সংস্থান ও গতিবিধি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা গেল। বিজ্ঞানীরা সবাই মেনে নিলেন নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়ম ও তত্ত্ব প্রকৃতির মূল নিয়ম বলে। নিউটনের নিয়মের উপরই গড়ে উঠল পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিচিত্র সৌধ, এবং তা থেকেই বিশ্বজগৎ যে একটি সুনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রবিশেষ এই ধারণার সৃষ্টি হল। পাকা আপেল ফল যখন গাছ থেকে মাটির দিকে পড়ে, তখন ওর গতিবেগ কোন এক নির্দিষ্ট হারে ক্রমশ বাড়তে থাকে; চন্দ্র যখন পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসেন তাতে তাঁর সময় লাগে ২৯½ দিন। এই দুই ঘটনার মধ্যে যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে তা সাধারণত মনে হয় না। কিন্তু মহাকর্ষ ও গতিশক্তির নিয়মে—পড়ন্ত আপেল ও চন্দ্রের পরিক্রম-কাল—এই আপাত অসংলগ্ন ঘটনা দুটিকে যদি স্পষ্টভাবে বোঝানো যায়, তবে এরা যে সনাতন প্রাকৃতিক নিয়ম তাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। বস্তুজগতের প্রকৃতস্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয় তখন সহজ। তাই নিউটনের প্রবর্তিত নিয়মকে অবলম্বন ক'রে বিজ্ঞান

গড়ে উঠেছে দুই শতাব্দী ধরে। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঊনবিংশ শতাব্দী অবধি ধরা পড়ে নি। নিউটনের সূত্র ও মহাকর্ষের নিয়মকে তাই বিজ্ঞানীরা মেনে নিলেন সৃষ্ট জগতের মূল ধারারূপে, যার শাসনে বিশ্বের স্থিতি রয়েছে অবিচলিত হয়ে। একে ভিত্তি করে যে দেশ বা কালের কাঠামোতে তাঁরা বিশ্বের স্বরূপ বা ছবি এঁকেছেন—তা হল আমাদের চলতি ধারণার দেশ ও কাল। একে আমরা নিত্য (absolute) দেশ বা নিত্য কাল বলে থাকি।

যে সব ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করি, একসূত্রে গাঁথা মুক্তোর মত তাদের পর-পর সাজান যায়। ঘটনাবলীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার এই যে সূত্র একে বলি আমরা কাল এবং এদের পরম্পরার শৃঙ্খলাকে বলি ভূত ও ভবিষ্যৎ। সুতোয় গাঁথা দুটি মুক্তো যখন পাশাপাশি পরস্পরকে স্পর্শ ক'রে না থাকে, তখন তাদের মধ্যে সুতোর খানিকটা ফাঁক থেকে যায়। সেরূপ দুটি ঘটনাও পর-পর নিরবচ্ছিন্ন না ঘটতে পারে। এ দুই ঘটনার মধ্যে যে ফাঁক, আমাদের মনের কোন নিগূঢ় প্রক্রিয়ায় তাকে আমরা অনুভব করি কম বা বেশী বলে। কোন দুই নির্দিষ্ট ঘটনার মধ্যে যে ফাঁক বা কাল তা আমরা সকলেই অনুভব করি প্রায় সমান পরিমাপের বলে। তাই আমরা মনে করি এই কাল বা সময়ের সঙ্গে আমাদের কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই। নদীর প্রবাহের মত এ ছুটে চলেছে আমাদের অনুভূতি ও চেতনার পাশ দিয়ে। বিজ্ঞান এই কালপ্রবাহের গতিকে নির্ভুলভাবে মাপছে কতকগুলি ঘটনার সাহায্যে যা ঘটতে থাকে ঠিক সমান ফাঁকে; যথা, পৃথিবীর মধ্যরেখার উপর দিয়ে প্রত্যহ সূর্যের গতি, ঘড়ির দোলকের দোলন প্রভৃতি।

দেশ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা সম্পূর্ণ অন্য রকম। ঘটনাসমূহকে পর-পর কালের এক সূত্রে বা পংক্তিতে সাজান যায়। কিন্তু আমাদের চারদিকের আকাশ বা দেশের মধ্যে বস্তুরাজিকে সাজানো যেতে পারে তিন প্রকারে—সামনের দিকে অগ্রপশ্চাৎ করে, পাশাপাশি ডাইনে বামে এবং ঊর্ধ্বে অধে পর পর ভাবে। কোন নির্দিষ্ট বস্তু হইতে অন্য কোন বস্তুর অবস্থান জানতে হলে তার এই তিন দিকের দূরত্বের পরিমাপের আবশ্যক হয়। তাই দেশ বা

আকাশকে ত্রৈমাত্রিক এবং কালকে একমাত্রিক বলা হয়। পর-পর দুটি ঘটনার অবকাশ বা অন্তরকে মাপবার জন্য কালের একটি মাপকাঠি বিজ্ঞানীরা করেছেন। দুটি বস্তু যদি পরস্পর লগ্ন হয়ে না থাকে, তাদের ফাঁক বা অন্তরকে মাপবার জন্য সেরূপ একটি দূরত্বের মাপকাঠির ব্যবহার হয়। একই মাপকাঠি ব্যবহার করলে দেশের পরিমাপও সকলের নিকট এক হয়। এই কারণে কাল ও দেশকে নিরপেক্ষ বা নিত্য বলে ধারণা করা হয়েছে। কোন একটি স্থির নির্দিষ্ট মুহূর্ত হতে এই কালের গতি মাপা যায় এবং কোনো এক চিরস্থির সুদূর নক্ষত্রপিণ্ডের অবস্থান হতে কোন চলতি পদার্থের দূরত্ব মেপে তার প্রকৃত গতি নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ দেশ এবং কাল ধ্রুব ও নিরপেক্ষ এবং উভয়ের সত্তা স্বতন্ত্র ও অসংলগ্ন, এই ছিল নিউটন ও উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। অন্যভাবে বলা যায়, কালের সূত্রকে জরিপ করে আমরা ঘটনাবলীর এবং দেশের ব্যাপ্তিকে জরিপ করে বস্তুর অবস্থানের খবর পেতে পারি।

মাইকেলসন ও মরলির বিখ্যাত পরীক্ষার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। বিশ্বজগতের কোন পদার্থই যে স্থির নয়, সবাই চঞ্চল ও গতিশীল, এই বিষয়টি তিনি বিশেষ করে নির্দেশ করেছেন। ফলে কোন বস্তুরই গতি, যা আমরা মেপে ঠিক করি, তা তার স্বকীয় ধ্রুব গতি নয়—কিন্তু আপেক্ষিক গতি। সেইরূপ কালেরও কোন স্থিরতা নেই। কোন ঘটনা যখন ঘটে, সেই ঘটনার সময়টি—যাঁরা ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন তাঁদের সকলের নিকট এক হতে পারে না। সুদূর নক্ষত্রপিণ্ডে যদি কোন ঘটনা ঘটে, আর ঐ নক্ষত্র হতে পৃথিবীতে আলো আসতে যদি লাগে দশ বছর, তবে ঐ নক্ষত্রবাসী যে ঘটনা এখন দেখবে আমি পৃথিবীবাসী তা দেখব দশ বছর পরে। অর্থাৎ নক্ষত্রবাসীর কাছে যা বর্তমান ঘটনা আমার পক্ষে তা ভবিষ্যৎ, এবং আমার পক্ষে যা বর্তমান নক্ষত্রবাসীর পক্ষে তা অতীত। সুতরাং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কোন নিত্যতা নেই

—তারা আপেক্ষিক। আমরা যদি এমন কোন যানবাহনের সৃষ্টি করতে পারতাম, যার গতি হত আলোর গতির চার-পাঁচ গুণ বেশী, তবে ঐ যানে চড়ে তিন-চার বছর পূর্বেকার কোন অতীত ঘটনার পিছনে ছুটে তার পুনরভিনয় আবার আমরা দেখতে পেতাম। বার বছর আগে কবি শান্তিনিকেতনে বসে উপদেশ দিয়েছেন, ঐ ঘটনাটি তেজতরঙ্গে আরোহণ করে অতীতে চলে গেছে। এখন আমরা যদি ঐ কল্পিত দ্রুতগামী যানে উঠে তার পশ্চাদনুসরণ করি, তবে কবিকে সশরীরে আবার আমাদের মধ্যে দেখতে পাব। কোন বস্তু যখন বেগে চলতে থাকে, আমরা বোধ করি তার গতির দিককার বিস্তার যাচ্ছে খর্ব হয়ে; এবং ঐ বস্তুর সঙ্গে যদি কোন ঘড়ি থাকে তবে আমরা বোধ করব যে ঐ ঘড়ির কাঁটাও চলছে বড় আস্তে আস্তে। অর্থাৎ ঐ চলন্ত বস্তুর মধ্যে কালের প্রবাহ চলছে ধীরে। তবে ঐ বস্তুতে যদি কোন পাহারা থাকে সে নিজে তা কিছুই অনুভব করতে পারবে না। যখন কোন রেলগাড়ি বেগে চলতে থাকে, বাইরে থেকে আমরা দেখতে পাই তার ভিতরকার সব জিনিসপত্র যে দিকে গাড়ি চলছে সেদিকে যেন চ্যাপটা হয়ে গেছে। কিন্তু গাড়ির লোকেরা নিজেরা তা মোটেই অনুভব করে না। কিন্তু তারাও বাইরের সব জিনিসকে ঐরূপ একই দিকে চ্যাপটা দেখে; সময়ের বেলাও তাই খাটে। যদি কোন এরোপ্লেন সেকেণ্ডে ১,৫০,০০০ মাইল বেগে চলতে থাকে এবং আমরা বাইরে থেকে যদি চালকের গতিবিধি ও কাজকর্ম দূরবীনযোগে পরীক্ষা করতে পারি, তবে দেখব তার সময় চলেছে খুব ধীরে ধীরে। সে যদি চুরুট খেতে থাকে, আমরা দেখব তার চুরুট পোড়া শেষ হতে যে সময় লাগে, তাতে আমাদের ঐ জাতীয় দুটো চুরুট যায় শেষ হয়ে। আমাদের একটা চুরুট পুড়তে যদি যায় পাঁচ মিনিট, তবে দেখা যাবে এরোপ্লেনের চালকের ঐ একই রকম চুরুট পুড়তে লাগছে দশ মিনিট। সেও পুনরায় দেখবে, তার সময় চলছে ঠিকই—বরং আমাদের সময় চলছে বড় ধীরে ধীরে। এরোপ্লেন হতে আমাদের দূরত্বের জন্য আলো চলার সময় হিসাব ক'রে বাদ দিলেও কালের গতির এই আপাত

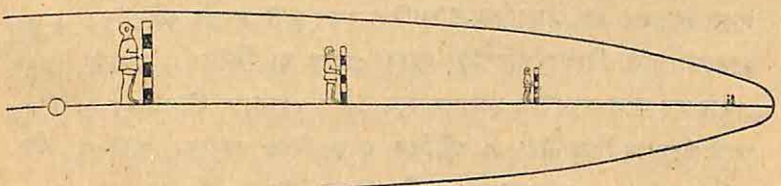
তফাত থেকে যায়। অর্থাৎ আমাদের নিকট মনে হবে এরোপ্লেনের লোকের জীবনে যা এক ঘণ্টা, আমাদের নিকট তা দেড় ঘণ্টা। সেরকম এরোপ্লেনের লোকের নিকট মনে হবে, তার নিকট যা দেড় ঘণ্টা আমাদের তা এক ঘণ্টা। মানুষের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ঘড়ির দোলকের দোলনের মত সমকালীন। তাই আইনস্টাইনের মতে মানুষের হৃদয়-যন্ত্রটিও একটি ঘড়ি বিশেষ। যদি কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে আণবিকশক্তিতে পরিচালিত এরোপ্লেনে চেপে সেকেণ্ডে ১,৫০,০০০ মাইল বেগে আকাশপথে দশ বছর কাল ঘুরে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে, তখন সে দেখে অবাক হয়ে যাবে যে তার বয়স গেছে চার বছর কমে। কারণ, ঐরূপ অসাধারণ বেগে আকাশপথে সে যখন চলতে থাকবে, তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যাবে মন্থর হয়ে ; ফলে, তার শ্বাসপ্রশ্বাস ও অন্যান্য শারীরিক প্রক্রিয়াও তখন চলবে ধীরে ধীরে। কিন্তু যতক্ষণ সে এরোপ্লেনে উড়ে বেড়াবে, ততক্ষণ সে তা বুঝতে পারবে না ; কেন না তার ঘড়িও তখন চলবে সমান মাত্রায় ধীরে ধীরে। দেশের বিস্তারেও এরূপ তফাৎ বোধ হবে। এরোপ্লেনের চালক যদি একটি এক ফুটের মাপকাঠি এরোপ্লেনের গতিমুখে লম্বালম্বি ধরে দাঁড়ায়, আমরা তাকে দেখব ⅔ ফুট মাত্র। অন্য দিকে আমরাও যদি সেরকম একটি এক ফুটের মাপকাঠি ধরে দাঁড়াই, তবে এরোপ্লেনের চালকের নিকট তা মনে হবে ⅔ ফুট। এর ফলে বিশ্বজগতের কোন ঘটনা সকল দর্শকের নিকট একই সময়ে ও একই স্থানে ঘটছে বলে মনে হবে না। কালের ও দেশের মাপের এই তফাৎ ধরা পড়ে দর্শকগণের পরস্পর আপেক্ষিক গতি যখন আলোর গতির প্রায় কাছাকাছি হয়। এই কারণে ব্যবহারিক জগতে আমরা দেশ ও কালের এরূপ কোন তফাত দেখতে পাইনে। তাই নিউটনের নিয়মমতে আমাদের দেশ ও কালের হিসাব যায় বেশ মিলে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে দেশ ও কালের সকল প্রকার মাপ আপেক্ষিক ; এদের কোন নিজস্ব মাপ নেই। আবার কোন ঘটনার বর্ণনা করতে হলে যদি ঘটনার স্থানটিই কেবল নির্দেশ করা যায়, তবে ঐ বর্ণনা থাকে অসম্পূর্ণ। শুধু কলকাতায় বোমা পড়েছে বললে কোন অর্থ হয় না। খবরটাকে খবরের

মত করে বলতে হলে কোন্ সময়ে বোমা পড়েছিল তারও উল্লেখ আবশ্যক হয়। সুতরাং কোন ঘটনার কালগত ও দেশগত অবস্থান দুইকে একযোগে প্রকাশ না করলে তার সঠিক বর্ণনা করা যায় না। ত্রৈমাত্রিক দেশের সঙ্গে একমাত্রিক কালকে জুড়ে চতুর্মাত্রিক দেশ-কালের কাঠামোতে আমরা ঘটনাবলীর সার্বজনীন বর্ণনা করতে পারি। কারণ দেশের ও কালের স্বতন্ত্র ধারণা আপেক্ষিক, পৃথক-ভাবে তাদের কোন ধ্রুব বা সার্বজনীন অর্থ নেই। দর্শকের নিজের অবস্থিতি ও গতির উপর দেশের ও কালের মাপ যায় বদলে। একের মাপ নির্ভর করে অন্যের মাপের কাঠির উপর। কিন্তু দেশ-কালের সমন্বয়ের যে মাপ তা সকল দর্শকের পক্ষে সকল অবস্থাতেই সমান। এই হল আপেক্ষিক তত্ত্বের মূল ভিত্তি। বিজ্ঞানীরা তাই আজ নিউটনের নিয়মের উপর স্থান দিয়েছেন আইনস্টাইনের এই তত্ত্বকে। আসলে আমরা কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ বা অনুভব করি না, করি ঐ বস্তুর মধ্যে বা বস্তুর সহযোগে যে ঘটনা ঘটছে তাকে। যখন আমরা বলি জল দেখছি তখন বস্তুত আমরা প্রত্যক্ষ করছি জল হতে আলোর প্রতিফলন-রূপ ঘটনাকে। এই অবস্থায় দেশ এবং কালের স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না। বিরাট বিশ্বের মহাদেশে কলিকাতার কোন অবস্থান নির্ধারিত নেই, যদি না তার সঙ্গে বলা হয় অমুক সালের অমুক দিনের অমুক সময়ের কলিকাতা; কারণ আমাদের পৃথিবী ছুটে চলেছে দেশ ও কালের মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে [চিত্র ২ দ্রষ্টব্য]।

দেশ ও কালের স্বাতন্ত্র্যকে বিলোপ ক'রে যেমন এক যৌগিক সত্তায় পরিণত করা গেল, সেরূপ জড়ের মাপও যে আপেক্ষিক এবং জড় ও শক্তি যে স্বতন্ত্র নয়, পরন্তু একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ, একথাও আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইতিপূর্বে বিজ্ঞানী কাউফমান তাঁর পরীক্ষার ফলে দেখতে পান যে, ইলেকট্রনের ভর তার গতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। আইনস্টাইন প্রমাণ করলেন যে জড়বস্তু যখন শক্তি শোষণ করে, তখন তার ভর যায় বেড়ে; সেরূপ যখন তা

থেকে শক্তি বিকীর্ণ হয়, তার ভর যায় কমে। এই বাড়তি বা কমতি অতি সামান্য হলেও তা নিশ্চিত। অতএব জড়ের ভর বলতে বুঝায় তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে। জড় ও শক্তির রূপান্তর সম্বন্ধে আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি।

দেশের প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে জানা গেছে। মহাকর্ষের কারণ ও প্রকৃতি বুঝতে হলে দেশের বিস্তার বা অবয়ব যে আঁকাবাঁকা তাই নিতে হয় মেনে, যদিও তার অনুভূতি আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ফলে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই বিশ্বজগৎ সসীম বা সান্ত, অনন্ত বা অসীম নয়। সসীম হলেও তার বিশালতা আমাদের ধারণার অতীত। আইনস্টাইনের হিসাব মতে, বিশ্বজগতের পরিধি ৪০ কোটি আলো-বছরের দূরত্বের সমান। মনে রাখতে হবে আলো চলে সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। অবশ্য এই সসীম বিশ্বজগৎ—বিজ্ঞানের বিশ্বজগৎ, একথা আমাদের বোধ ও বুদ্ধির অতীত; কেননা বিশ্বজগৎকে সসীম বলে মানবার আগে ঐ সীমার বাইরে যে কি আছে এই প্রশ্নের মীমাংসার আবশ্যক হয়। একটা সুন্দর উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে, যাতে বিশ্বজগৎ সসীম হয়েও আমাদের



চিত্র ৩—অসীম যদিও সসীম

বোধে আসে অসীমরূপে। কোন প্রকাণ্ড বৃত্তসমতলের কেন্দ্র হতে বহির্দিকে যদি আমরা চলতে থাকি এবং যতই এগোতে থাকি ততই আমাদের দেহ ও আমাদের মাপকাঠি যায় ছোট হয়ে, তবে কোন কালেই আমাদের মাপ শেষ হবে না। আমরা মনে করব আমরা আছি বা চলছি এমন একটা দেশে যা অসীম বা

অন্তহীন [চিত্র ৩ দ্রষ্টব্য]। এই দৃষ্টান্তটি রচনা করেছেন ফরাসী গণিতবিজ্ঞানী পঁইকার।

সম্প্রতি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার ফলে এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ সিদ্ধান্তে বিশ্বজগতের সংস্থিতি যাচ্ছে ক্রমশ বেড়ে, অর্থাৎ বিশ্বজগৎ অচল নয়, সচল। দূরবীন যোগে দেখা গেছে যে আকাশপথে ছায়াপথ-গুলির পরস্পর ব্যবধান ভীষণ বেগে অবিরত যাচ্ছে বেড়ে। দূরের ছায়াপথগুলি আমাদের পৃথিবী হতে সরে পালাচ্ছে ঘণ্টায় প্রায় বিশ কোটি মাইল বেগে। আরো কিছুকাল পরে এরা যখন আলোর বেগে ছুটে পালাবে, তখন চিরকালের জন্য তারা আমাদের কাছে যাবে অদৃশ্য হয়ে। ফলে, আমাদের এই বিশ্বজগৎ ক্রমশ যাচ্ছে বেলুনের মত ফেঁপে বা স্ফীত হয়ে। এ স্ফীতি বা প্রসারণের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে কোন কোন বিজ্ঞানীরা কল্পনা করেছেন যে সৃষ্টির গোড়ায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ছিল অণ্ডের মত একটি অপেক্ষাকৃত ছোট পিণ্ড। একদা হঠাৎ কোন অজ্ঞেয় কারণে এ পিণ্ড গেল ফেটে এবং তা'হতে ছুটে চারদিকে বেগে বেরিয়ে পড়ল বিশ্বের সমস্ত বস্তুসত্তা। সে হতেই আরম্ভ হল সৃষ্টির প্রক্রিয়া—নীহারিকা, ছায়াপথ ও নক্ষত্ররাজির গঠন। ঐ ছড়িয়ে পড়ার ভয়ঙ্কর বেগেই সকল ছায়াপথ এবং নীহারিকা ইত্যাদিও ক্রমশ ছুটে চলেছে বহির্মুখে। এ তত্ত্ব মানতে গেলে বিশ্বের পরিণতি ঘটবে প্রলয়ে বা নির্বাণে। কেননা, ক্রমশ প্রসারণের ফলে আমাদের ছায়াপথ হয়ে উঠবে মহাকাশে দ্বীপের মত সঙ্গীহীন। তাই বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এ স্ফীতির কারণ নির্ণয় করেছেন অবিরাম সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় নিত্য নূতন ছায়াপথ ও নীহারিকার উদ্ভবে। এ সব আগন্তুকদের চাপে ও পেষণে ছুটে পালাচ্ছে নক্ষত্রলোকের পুরানো বাসিন্দা। এতেই বিশ্বের সংহতি রয়েছে বজায়, যদিও তার আয়তন যাচ্ছে বেড়ে।

আইনস্টাইনের এই সব ধারণার প্রমাণ পাওয়া গেছে বিশ্বজগতের দুই সীমান্ত হতে—সূক্ষ্মতম ও অলক্ষ্যতম পরমাণুলোক এবং বিরাটতম ও বিপুলতম জ্যোতিষ্কপ্রদেশ।

নিউটনের প্রবর্তিত নিয়মের সাহায্যে ব্যবহারিক জগতের ঘটনাবলী বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু নক্ষত্রজগতের ঘটনাবলী নির্ভুলভাবে বুঝতে হলে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক-তত্ত্বের দরকার হয়; সেইরূপ পরমাণু-লোকের সঠিক খবর জানতে হলেও আমাদের আবশ্যক করে শক্তিকণিকাবাদের প্রয়োগ।

আমরা যদি ইলেকট্রনের মত ছোট জীব হতাম, তবে আমরা দেখতাম বিশ্ব-জগতের এক নূতন চেহারা; ছোট ছোট জড়কণা প্রচণ্ডগতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে উদ্দাম নৃত্যে। আবার যদি আমরা সূর্যের মত প্রকাণ্ড হতাম তখনও বিশ্ব-জগতের আর একপ্রকার চেহারা আমাদের চোখের সামনে উঠত ভেসে; সেখানেও দেখতাম মহাসমুদ্রে দিক্‌হারা মোটর-বোটের মত গ্রহ নক্ষত্র সবাই মিলে অস্থির হয়ে মহাশূন্যে ছুটোছুটি করছে। এই দুই জগতের স্বরূপ আমাদের বোধের ও ধারণার অতীত—আমাদের দৈহিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দরুন। আমরা যে দেহ নিয়ে জন্মেছি এবং যে পৃথিবীর উপর বাস করছি, তাতে বিশ্ব-জগতের যে স্থিতিশীল স্বরূপ আমরা ধারণা করতে পারি তারই নিয়ম আবিষ্কার করেছেন ইউক্লিড, গেলিলিও এবং নিউটন। নক্ষত্রজগতের রীতিনীতির সঠিক সন্ধান বের করেছেন আইনস্টাইন। দেশ ও কালের স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসের দরুন নিউটনের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মে যে ত্রুটি ছিল তারই সংশোধন হল আইন-স্টাইনের গবেষণায়। প্রাকৃতিক নিয়মকে যথাসম্ভব সার্বভৌমিক ও সর্বাবস্থায় অপরিবর্তনীয় বা অমোঘ করে জানতে হলে, এই সংশোধন হয় অপরিহার্য।

বিশ্বজগতের বৈচিত্র্যের জটিলতার মধ্যে ঐক্যের যে কার্যকর বাঁধন বা মূল নিয়ম রয়েছে তারই আবিষ্কার হল বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। এই মূল নীতি এক—যার সাহায্যে সকল বৈচিত্র্য, সকল ঘটনাপরম্পরা এবং সকল জটিলতার হয় সমাধান; সকল শক্তির ও সকল সত্তার প্রকৃত স্বরূপ হয় উদ্‌ঘাটন। যে সব নিয়ম বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন তারা সবই ঐ একেরই বিভিন্ন বা আংশিক প্রকাশ মাত্র।

নিউটনের প্রবর্তিত মহাকর্ষবাদের উপর যে জগৎ বিজ্ঞানীরা গড়ে তুলেছিলেন তা আমাদের দৃশ্যমান ব্যবহারিক জগতেরই অনুরূপ। যখন অধিকতর শক্তিশালী ও উন্নততর যন্ত্রের উদ্ভাবনে দেখা গেল যে বিশালতম নক্ষত্রলোক ঠিক নিউটনের নিয়ম মেনে চলে না, তখন তার সংশোধন করলেন আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকবাদে। আইনস্টাইন যে নিউটনকে ছেড়ে আরও এগিয়ে গেছেন, এই বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত।

আইনস্টাইন বিশ্বজগতের স্বরূপ সম্বন্ধে যে চিত্র এঁকেছেন তা সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁর মতে মহাকর্ষ বা অন্য কোন বলের অস্তিত্ব কিংবা জড়পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের চলতি ধারণা মেনে নেবার কোন সংগত কারণ নেই। দেশ-কালের বিশিষ্ট ধর্মের উপরই এদের আপাতপ্রকাশ নির্ভর করে। আসলে শক্তি বা বল বলে কিছু নেই। চতুর্মাত্রিক দেশ-কালের পরিব্যাপ্তিতে যেখানে জড়পদার্থের অবস্থিতি ঘটে, তার চারিদিকে একটি বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। তার ফলে দেশ-কাল ঠেলা খেয়ে সেখানে হয়ে ওঠে তুঙ্গ, পৃথিবীর পৃষ্ঠে আমরা যেমন পাহাড় দেখতে পাই তেমনি। কোন বস্তু চলতে চলতে যখন তার সামনে এসে পড়ে, তখন দেশ-কালের খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে যাওয়া তার পক্ষে হয় কষ্টসাধ্য। তাই সে খোঁজে সহজ পথ, এবং পাহাড়ে ওঠার সহজ পথ হচ্ছে তাকে প্রদক্ষিণ করে চলা। প্র:তির রাজ্যে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় যে যখন কোন পদার্থ আপনা থেকে চলতে থাকে সে চলে যথাসম্ভব অধিক সময় নিয়ে, আমরা যেমন কোন কাজের তাড়া না থাকলে আপন মনে রাস্তায় চলি। কোন কোন বিজ্ঞানী একে 'মহাজাগতিক আলস্যের নীতি বা বিশ্বকুড়েমি' (Law of Cosmic Laziness or Principal of Least Action) নাম দিয়েছেন। কথাটি শোনায় বড় অদ্ভুত। যে সব জ্যোতিষ্ক এমন প্রচণ্ডবেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কুড়ে বলা হয় কোন্ বিচারে? এত বেগ সত্ত্বেও সোজা পথে না ছুটে যারা বাঁকা পথে ঘুরে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করে তারা নিশ্চয়ই কুড়ে। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহাদি তাই সূর্যের সন্নিহিত দেশ-কালের তুঙ্গ শৈলের চারদিকে প্রদক্ষিণ

করছে এই নীতির অনুসরণ ক'রে, নিউটনের মহাকর্ষের দরুন নয়। সূর্য রয়েছেন এই দেশ-কালের পাহাড়ের চূড়ায় বসে। জড়পদার্থমাত্রকেই দেশ-কালের পরিব্যাপ্তিতে উত্তুঙ্গ বৈষম্যরূপে অনুমান করা যেতে পারে। এক-একটি জড়বস্তু যেখানে অবস্থিতি করে সেখানে যেন এক-একটি দেশ-কালের পাহাড় ওঠে এই পরিব্যাপ্তির সাম্য ও সুসংগতি নষ্ট করে। জড়পদার্থ যে অণুপরমাণুর সমষ্টি, আমাদের এই পুরানো ধারণা এতে একেবারেই যায় বদলে। আইনস্টানের মতে বিশ্বজগতের উপাদান হচ্ছে ঘটনারাজি। আসলে আমরা কোন পদার্থকে অনুভব করতে পারি না; ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বা যন্ত্রসহযোগে যা আমরা অনুভব করি তা হল ঘটনা। কোন বস্তুর অনুভূতি তাই ঘটনা-পরম্পরার অনুভূতি। একটি জড়পরমাণুকে তাই ঘটনাপরমাণুর সমষ্টি বলা যেতে পারে। আমাদের পুরানো ধারণা মতে একটি জড়পরমাণুর অস্তিত্ব ছিল শুধু দেশে সীমাবদ্ধ, কালে সংরক্ষিত; অর্থাৎ জড়পরমাণুর ধ্বংস নেই এবং একই সময়ে উহা দুই স্থান অধিকার ক'রে থাকতে পারে না। এই ধারণার ভিত্তি ছিল কাল ও দেশের স্বাতন্ত্র্যে। দেশ ও কালকে একসঙ্গে জুড়ে নিলে, বিশ্বের উপাদান হবে এমন সব কণিকা যা দেশ এবং কাল উভয়ত সীমাবদ্ধ। এদেরই নাম দেওয়া হয়েছে ঘটনাকণিকা বা ঘটনা-পরমাণু। এই সব ঘটনাপরমাণু ক্ষণস্থায়ী—এরা মুহূর্তের জন্য জন্মায় ও মুহূর্তেই লোপ পায়। যখন আমরা বলি যে আমরা একটি পাহাড় দেখছি, তখন যথার্থ পাহাড় বলে কিছু আমরা দেখি না। পাহাড় দেখাটা যেন একটি মায়া। বস্তুত আমরা কতকগুলি আলোকতরঙ্গের সংস্পর্শে আসি আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সহযোগে। এই আলোকতরঙ্গগুলি আমাদের চোখে প'ড়ে কতকগুলি ঘটনার সৃষ্টি করে, তারা আবার আমাদের স্নায়ুতন্তুতে সৃষ্টি করে অন্যবিধ ঘটনা, এবং এগুলিই পুনরায় আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে ঘটায় নূতন ঘটনা। এই সব ঘটনার যে-কোনটি সত্যকার পাহাড় না থাকলেও আমাদের মধ্যে পাহাড়ের অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারত—যেমন স্বপ্নে, ভ্রমে ও নেশার ঘোরেও লোকে পাহাড় দেখতে পায়। এরা সব আলোকতরঙ্গের বা কম্পনের ঘটনা, যা একটি কেন্দ্র হ'তে

চারদিকে ছড়াতে থাকে, জলের ঢেউ যেমন ছড়ায় চক্রাকারে। এইসব কেন্দ্র আবার স্থির হয়ে থাকে না ; দেশ-কালের পরিব্যাপ্তিতে শূন্যাকাশে প্রতিনিয়ত এদের অবস্থান যাচ্ছে বদলে। এই সব কেন্দ্রকে আমরা জড়পরমাণু বা তার উপাদান ইলেকট্রন, প্রোটনরূপে অনুমান করি। এরাই ঘটনার কারণ। এই সব ঘটনার সাহায্যেই আমরা অলক্ষ্যতম ইলেকট্রন বা প্রোটনের অস্তিত্বের জ্ঞান লাভ করি। আসলে ঘটনা ভিন্ন আর কিছুর অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা দিতে পারি না। এই সব আলোক-কম্পনরূপ ঘটনার প্রবাহ চলছে যার ভিতর দিয়ে তাকে বলি আমরা দেশ বা শূন্যাকাশ। বিজ্ঞানীরা এই আলোক-কম্পনের নিয়মের সন্ধান ও আবিষ্কার করেছেন। কেন্দ্র ও কেন্দ্রের সন্নিহিত স্থানে এই সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। এই কেন্দ্র ও কেন্দ্রসন্নিহিত দেশকে তাই আধুনিক বিজ্ঞানীরা জড়বস্তুরূপে অনুমান করেছেন। অবস্থাবিশেষে ইহা ইলেকট্রন, প্রোটন বা জড়পরমাণুরূপে গণ্য হয়। মোট কথা, ইলেকট্রন বা প্রোটন কি, বা তাদের ভিতর কি ঘটনা ঘটছে তা আমাদের পক্ষে জানা একেবারে অসম্ভব।

নিউটনের মতে সৌরজগতে সূর্য ছিলেন সম্রাটের মত এবং গ্রহাদি ছিল তাঁর শাসনের অধীন ; আইনস্টাইনের জগৎচিত্রে আমরা দেখতে পাই শাসন বা শক্তি গেছে উড়ে। বিশ্ব যেন একটি ব্যক্তিতন্ত্র রাজ্য। এই রাজ্যে কোন ছটফটানি, হুটোপাটি বা ছুটোছুটি নেই। সবাই চলছে গজেন্দ্রগমনে, সবাই শ্রমবিমুখ, আয়াসের পথ চলে সবাই এড়িয়ে। এই রাজ্যে না আছে কোন রাজা বা কেন্দ্র-বল (যেমন নিউটনের মহাকর্ষ)। তথাপি তার শৃঙ্খলা রক্ষিত হচ্ছে, কেননা প্রত্যেকেই চলছে আপনা থেকেই নীতির আইন মেনে।

আইনস্টাইনের মতে বিশ্বজগৎ হচ্ছে ঘটনার বা আলোকতরঙ্গের লীলা-খেলা। এতে না আছে জড়, না আছে শক্তি বলে কোন সত্তা। বস্তু ও শক্তি মনে করি আমরা যাকে, তারা আসলে তা নয়। দৃশ্যমান জগৎ হচ্ছে মায়াময়। কবির কথায় বলা যায়, "যা আছে তা নাই, আর যা নাই তা আছে।" এখানে বৈদান্তিক মায়াবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের মায়াবাদ যায় মিলে।

হেতুবাদ ও নৈশ্চিত্যবাদ

মানুষ যখন ঠিক সভ্য হয়ে ওঠেনি, তখন সে মনে করত চারদিকে যে সব ঘটনা ঘটছে, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র, পাহাড় নদী হ্রদ সমুদ্র যা কিছু সে দেখতে পাচ্ছে, এ সব দেবদেবী বা দৈত্যদানবের খেয়ালের ফল। পবনদেবতা যখন যান রেগে তখন বইতে থাকে ঝড়; ইন্দ্র যখন রুষ্ট হয়ে ছুঁড়ে মারেন তাঁর আয়ুধ তখন পড়ে বাজ। সূর্যদেবতা তাঁর শখ মেটান রোজ রোজ রথে চেপে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়ে। চাঁদ চলেন রাতের বেলা তাঁর কলঙ্কের বোঝা নিয়ে। বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে মানুষের এই ধারণার যুগকে আমরা 'দৈবযুগ' বলতে পারি।

পরবর্তীকালে সভ্যতার আলোতে বিচার ও বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের ফলে, এরূপ ছেলেভুলানো কথায় মানুষের মন আর সায় দিতে পারল না। তার অন্তরের নিগূঢ় প্রেরণায় প্রকৃতির রহস্য জানবার জন্য সে আরম্ভ করল সাধনা। মানুষের মনের একটি স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে, সে বুঝতে চায় যা কিছু দেখে বা অনুভব করে, চায় তাদের কারণ নির্ণয় করতে। এই বোঝা তার হয় না, যতক্ষণ না সে বিবিধ জটিলতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে সহজ সরল ঐক্যের সন্ধান পায়। এই ঐক্যের সন্ধান করতে গিয়ে মানুষ প্রথমে রচনা করল তার ধর্ম ও দর্শন। তাই আমরা দেখতে পাই সকল সভ্য মানুষের ধর্মে ও দর্শনে জগৎস্থষ্টির কর্তা ধাতা ও নিয়ন্তারূপে এক বিধাতাপুরুষকে—যিনি গড়ে দিয়েছেন এমন সব অমোঘ বিধান যার শাসনে স্থষ্টি চলছে নিরুপদ্রবে শৃঙ্খলা বজায় রেখে।

মানুষের মন যখন তর্ক-বিচার ও অনুমান-কল্পনা ছেড়ে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দিকে ঝুঁকল, তখন শুরু হল বিজ্ঞানের চর্চা এবং বিজ্ঞানের যুগ। এই সম্বন্ধে গোড়ায় বিশেষ করে বলা হয়েছে। জড়বস্তুর উপর পরীক্ষা করে বিজ্ঞান আবিষ্কার করল শক্তির। তাই গড়ে উঠল বলবিজ্ঞান। মানুষ তৈরি করল

বিবিধ যন্ত্রপাতি যা লাগল তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাজে। নিউটন মহাকর্ষ বলের আবিষ্কার করে দেখালেন যে বিশ্বজগতের মূলেও রয়েছে সেই বলবিজ্ঞানের রীতিনীতি। তাই নিউটন ও তাঁর পরবর্তী বিজ্ঞানীরা বিশ্বের যে স্বরূপ গড়েছেন তাকে 'যান্ত্রিক স্বরূপ' বলা হয়েছে। এ মতে বিশ্বজগৎ হচ্ছে একটা পাকা কল ও যন্ত্র, কোথাও কোন খুঁত নেই এর নির্মাণ-কৌশলে বা বস্তুসম্পদে। এ চলে বলবিজ্ঞানের বিধান মেনে ; এ সব বিধান পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে সত্য ব'লে। তাই এরা হ'ল প্রাকৃতিক বিধান, সুতরাং সনাতন এবং অলঙ্ঘনীয়। একেই আগে বলা হয়েছে প্রাকৃতিক একানুবর্তিতা (The Uniformity of Nature)। বিশ্বজগৎ যখন একটি সুনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বা কল, তখন তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে এবং তার পর-পর অবস্থার মধ্যে যে একটা কার্যকারণ সম্বন্ধের সূত্র রয়েছে তা নিতে হয় মেনে। কেউ যদি ঘড়ির কলকৌশল পরীক্ষা করে জেনে নেয়, সে বলতে পারে তার কোন্ চাকাটি ঘুরলে পর আর কোন্ চাকাটি ঘুরবে, এবং শেষের চাকাটি ঘুরলে তারপর আর কোন্ চাকাটি ঘুরবে। এভাবে পরিশেষে মিনিট ও ঘণ্টার কাঁটা কি করে ঘুরবে তাও সে জানতে পারবে প্রথম দৃষ্টিতে। অতএব বিশ্বজগতে যে সব ঘটনা এখন ঘটছে তার কারণ হচ্ছে অতীতের ঘটনা ; এবং বর্তমানের ঘটনাও হচ্ছে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার কারণ। এইরূপে নিকট অতীতের ঘটনা নির্ধারিত হয়েছে দূর অতীতের ঘটনা দিয়ে। এক কথায় বলা যায়, সৃষ্টির প্রাক্কালে যে সব অবস্থা বর্তমান ছিল তারা এই অলঙ্ঘ্য নিয়মে জগতের সমস্ত ইতিহাস—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—রেখেছে নির্ধারিত ক'রে। এই নির্ধারিত পথ ছাড়া অন্য কোন পথে চলবার প্রকৃতিদেবীর উপায় নেই। কোন্ সুদূর লক্ষ্যাভিমুখে তিনি চলেছেন এই পথে, তা সব ঠিক করা রয়েছে গোড়া থেকেই। আজ যে পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে দেখা দিয়েছে তার কারণ পনের দিন পূর্বেকার অমাবস্যার অন্ধকার ; ঐ অমাবস্যার কারণ আবার তার প্রায় পনের দিন পূর্বের পূর্ণিমার রাত ; পুনরায় এই অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অন্যান্য শুক্লা এবং কৃষ্ণা তিথির কারণ হচ্ছে পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্রের নির্ধারিত গতি। সৃষ্টির

গোড়াতেই বেঁধে দেওয়া হয়েছিল চন্দ্রের এই গতি। তার ফল দাঁড়িয়েছে, চন্দ্র যে কক্ষে ঘুরপাক খাচ্ছে, তা থেকে তার আর নিস্তার নেই। কবির ভাষায় বলতে গেলে "অস্তিত্বের চক্রতলে একবার বাঁধা প'লে আছে কি নিস্তার।" হ্যালির ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে। তার ৭৬ বছর আগেও একবার পৃথিবীর আকাশে তার উদয়ের বিবরণ লেখা আছে। এখন আমরা বলতে পারি, ১৯৮৬ সালে যে উহা পুনরায় দেখা দেবে এই ভবিষ্যদ্বাণীকে নির্ধারিত সত্য ব'লে গণ্য করা যেতে পারে; হ্যালির ধূমকেতুর জন্মপত্রিকায় তা লেখা আছে। সংক্ষেপে বলা যায় জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 'সূত্রে মণিগণাঃ ইব' এক সনাতন শৃঙ্খলে রয়েছে গাঁথা। এই তত্ত্বই বিজ্ঞানে হেতুবাদ ও নৈশ্চিত্যবাদরূপে পরিচিত। বিশ্বজগৎ যে একটি পাকা যন্ত্রের মত তা উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছিলেন। বিজ্ঞানে হেতুবাদ ও নৈশ্চিত্যবাদের প্রচার হয় তার ফলে।

এই পাকা বিশ্বযন্ত্রটি নির্বিবাদে ও নিরাপদে চলতে থাকবে যদি কোন বাইরের বা ভিতরকার প্রভাব তার চলার পথে বাধা না দেয়। বিশ্বের সমস্ত জড়বস্তু ও শক্তি নিয়ে যখন বিশ্বযন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে, তখন তাকে বে-কল করে দিতে পারে একমাত্র কোন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (Free will)।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির যতই উন্নতি হতে লাগল, যতই শক্তিশালী ও যথা-সম্ভব নির্দোষ যন্ত্রের উদ্ভাবন হ'ল, ততই বিজ্ঞানীরা এমন সব তথ্যের আবিষ্কার করতে লাগলেন যাতে প্রকৃতির একানুবর্তিতার নীতি এবং হেতুবাদ ও নৈশ্চিত্যবাদের ভিত্তি গেল শিথিল হয়ে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান গড়ে উঠছে এই সব তথ্যের উপর। এই নূতন বিজ্ঞানের কথা পূর্বের অধ্যায়গুলিতে বিশেষ করে আলোচনা করা হয়েছে।

ইলেকট্রনের গতিবিধি পরীক্ষা করতে গিয়ে হাইসেনবার্গ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন ইলেকট্রনের অবস্থান বা ভর বেগ সঠিক করে কোন যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা অসম্ভব। অন্য দিকে যদি ইলেকট্রনকে তরঙ্গসংঘরূপে কল্পনা করা হয় তা হলেও এই অনৈশ্চিত্য দেখা দেয়। কণিকা হিসাবে ইলেক্ট্রনের

যে অনৈশ্চিত্য আমরা লক্ষ্য করি, তার কারণ আমরা যে সব উপায় প্রয়োগ ক'রে ইলেকট্রনের স্থিতি বা গতিবিধির নির্ণয় করি, তাতে তার স্বকীয় স্থিতি বা গতি যায় বদলে। জানবার চেষ্টাতেই যদি জ্ঞেয়বস্তুর অবস্থা যায় বদলে, তবে যা জানতে পারা যাবে তা তার আদিমস্বরূপ হবে না। কিন্তু তরঙ্গাকারে ইলেকট্রনের নিজেরই কোন নৈশ্চিত্য নেই। তাই তরঙ্গবাদে ইলেকট্রনকে দেখানো হয় একটা ঝাপসা মেঘের টুকরোর মত। এই মেঘের ভিতর ইলেকট্রন ঘুরে বেড়ায় আলোর বেগে, কখন যে ঠিক কোন্ জায়গায় তাকে পাওয়া যাবে তা সঠিক বলা অসম্ভব। তবে জানা গিয়েছে যে মেঘের কেন্দ্রস্থল থেকে যতই দূরে যাওয়া যায়, ইলেকট্রনের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনাও ততই কমে আসে। ৪নং চিত্রে একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর মধ্যে মেঘরূপী ইলেকট্রনের স্বরূপ দেখানো হয়েছে। প্রকৃতির রাজ্যে এই অনৈশ্চিত্যের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।



চিত্র ৪—মেঘরূপী ইলেক্ট্রন

আমরা পূর্বে দেখেছি তেজরশ্মি সময়-বিশেষে আপন চেহারা বদলে চলতে পারে—কখনো ঢেউ তুলে, কখনো বা ফোটন সেজে। এই ফোটনরূপী আলোক-কণিকা জলের পৃষ্ঠ হতে প্রতিফলিত হয় এবং জলের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করতে পারে। আলোর এই প্রতিফলন ও প্রতিসরণ একটি সাধারণ ঘটনা। জলের উপর আলো পড়লে আমরা দেখি খানিকটা আলো ছিটকে ফিরে আসছে এবং খানিকটা যাচ্ছে জলের ভিতর। কিন্তু একটি-মাত্র ফোটন যদি এসে জলের উপর পড়ে, তখন প্রতিফলিত হয়ে তা ফিরে আসবে, না জলে প্রবেশ করবে, এ কথা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারবে না। কোন্ পথে যে সে চলবে তা হয়ত তার নিজেরই জানা নেই। কারণ, উভয় পথই তার পক্ষে সমান দরের।

পূর্বে বলা হয়েছে যে ইউরেনিয়াম ও রেডিয়াম ধাতুর পরমাণুসমূহ অনবরত আপনা হতে ভেঙে যাচ্ছে। পরীক্ষায় দেখা যায় যে প্রতি মিনিটে হাজারকরা এক নির্দিষ্ট হারে এই জাতীয় পরমাণু ভাঙতে থাকে। ভাঙবার এই নির্দিষ্ট হারের কোন ব্যতিক্রম কখনো দেখা যায় না। যথাসম্ভব প্রবল তাপ, চাপ, আলো, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সকল প্রকার শক্তির প্রয়োগ করেও বিজ্ঞানীরা সামান্য পরিমাণেও এর হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাতে পারেন নি। যদি এখন দেখা যায় যে কোন এক টুকরো রেডিয়াম-ঘটিত পদার্থে এক লক্ষ রেডিয়াম-পরমাণু রয়েছে, তবে এক বছর পরে পুনরায় পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে দশটি পরমাণু গেছে ভেঙে। কিন্তু ঠিক কোন্ দশটি যে ভাঙবে, অর্থাৎ যদি সকল পরমাণুগুলিকে টিকিট মেরে নম্বর দিয়ে রাখা যায়, তবে ঠিক কোন্ কোন্ নম্বরের পরমাণু ভাঙবে, তা কোন বিজ্ঞানী বলতে পারবে না। শহরে মোটর চাপা পড়ে লোক-সংখ্যার বার্ষিক মৃত্যুর হার মোটামুটি বলা যেতে পারে। কিন্তু ঠিক কোন্ কোন্ অভাগার পশ্চাতে মহাকালের দূত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা যেমন কেউ বলতে পারে না—এও অনেকটা সেইরকম। মোটর-দুর্ঘটনায় যে মারা যায়, সেও যেমন তার আশুমৃত্যুর আশঙ্কা করতে পারে না, যে পরমাণুটি ভাঙবে সেও তার আসন্ন বিপদের খবর হয়ত কিছুই জানতে পারে না। এই প্রকারের অনৈশ্চিত্যের জন্য আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সংকীর্ণতা বা আমাদের উদ্ভাবিত যন্ত্রের অসম্পূর্ণতাকে দায়ী করা যায় না। এ হচ্ছে প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট ধর্ম। যদি কোন সংগত কারণ থাকে তা আমরা কোন কালেই জানতে পারব না। সমষ্টিগতভাবে রেডিয়াম ধাতুর বিশ্লেষণে বা তেজরশ্মির প্রতিফলন ও প্রতিসরণে আমরা যে নৈশ্চিত্য বা গড়ের নিয়ম (Law of average) দেখতে পাই, ব্যষ্টিগতভাবে কোন নির্দিষ্ট অণু, পরমাণু বা ফোটনের বেলায় মোটেই তা খাটে না।

ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞানীদের এই পাকা বিশ্বযন্ত্রটির মধ্যে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা বের করেছেন অনেক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা। মোটের উপর তাঁদের সিদ্ধান্ত হয়েছে বিশ্বজগতটা আসলে একটা যন্ত্র বা মেশিন নয়। এই সব ত্রুটি

বা অসম্পূর্ণতা ধরা পড়েছে শুধু সূক্ষ্মতম পরমাণুলোকের ভিতর এবং অতিকায় নক্ষত্রজগতে। আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক জগতটা মোটের উপর যন্ত্রের মতনই চলে এবং এই জগতে যা কিছু ঘটছে তা সবই রয়েছে কার্যকারণসূত্রে গাঁথা। এতে অনিশ্চিতের আশঙ্কা বা অদ্ভুতের বিশেষ কোন স্থান নেই।

উপসংহার

বিশ্বজগতের অন্তিম স্বরূপ বা বাস্তবের রূপ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান যে সিদ্ধান্তে এসেছে তার আলোচনা করা গেল। আমরা দেখেছি আমাদের ব্যবহারিক জগতের জড় ও শক্তি তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বরূপ হারায় সূক্ষ্মজগতের পরমাণু ও অতিপরমাণু লোকে। সেখানে তারা দেখা দেয় একই সত্তার রূপান্তর হিসাবে। উভয়ে মিলে যায় এক তেজরশ্মির কম্পনের মধ্যে। অন্য দিকে আমাদের ব্যবহারিক জগতের দেশ এবং কাল, যাদের ভূমিকায় জড় এবং শক্তি মিলে বিবিধ ঘটনা রচনা করছে, তাদেরও যায় স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে বিশাল নক্ষত্রলোকে। এই বিরাট জগতে দেশ এবং কাল যায় জুড়ে এক দেশ-কালের পরিব্যাপ্তিতে। এতেই সব বিশ্বঘটনা ঘটছে শুধু তেজের কম্পনে। জড় এবং শক্তি বলে সকল সত্তার নিদর্শন এখানে গেছে ঘুচে। এই সূক্ষ্ম এবং বিশাল জগৎ রয়েছে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সীমা ছাড়িয়ে। যে সব ঘটনা এই সব জগতে ঘটছে তার খবর পাই আমরা শুধু আমাদের যন্ত্রের সহযোগে। তা থেকে বুদ্ধি বিচার ও কল্পনার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা গড়ে তুলেছেন এই বিশ্বের অন্তিম স্বরূপ বা বাস্তবের রূপ। জড় ও শক্তি নিয়ে বহির্জগতের যে রূপ আমরা দেখতে পাই তা হচ্ছে বিশ্বের স্থূল স্বরূপ। এই স্থূল জড়বিশ্বকে তাই বলা হয়ে থাকে মায়াময়। কারণ তা লুকিয়ে রেখেছে জড়ের ও শক্তির বহিরাবরণ দিয়ে বিশ্বের মূল স্বরূপ বা বাস্তবকে। ব্যবহারিক জগতের ঘটনায় আমরা দেখতে পাই কার্যকারণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং নৈশ্চিত্যের অবিচলিত শাসন। বৃহৎ ও সূক্ষ্মজগতের পরীক্ষায় আবার

এদের ব্যতিক্রম দেখা যায়। ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এই বিশ্বব্যাবতনে অনৈশ্চিত্যের লক্ষণ আছে পরিস্ফুট হয়ে।

বিজ্ঞানকে আর জড়বাদী বলা চলে না। এরূপ দুর্নাম যদি কখনো কেউ রটাতে চান, তবে তাঁর বিরুদ্ধে আধুনিক বিজ্ঞানীরা ন্যায়ত মানহানির দাবি করতে পারেন। উনবিংশ শতাব্দীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বলবিজ্ঞানের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, সুনিশ্চিত যান্ত্রিক বিশ্বের ধারণা গেছে লুপ্ত হয়ে। গতিবিজ্ঞানের নিয়মের তাড়ায় ছোট ছোট জড়াণুর দল মহাকাশে ছুটোছুটি ক'রে মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে আশা-আতঙ্ক, হর্ষ-বিষাদ ; পুষ্পে সুষমা, সূর্যাস্তে শোভা, তুষার-ধবল হিমালয়ে মহিমা, সমুদ্রে উন্মুক্ততা, বিজ্ঞানীর মনে সৃষ্টিতত্ত্ব ও আপেক্ষিক-বাদের ধারণা, প্রেমিকের হৃদয়ে অনুরাগ ও সাধকের মনে ঈশ্বরানুভূতি—এরূপ ব্যাখ্যা এখন বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী কোন সমাজে চলে না। চিনির পরমাণুগুলির সংস্থিতি বদলে গেলে ওদের মিষ্টত্বের লোপ ঘটে। তাতে সুরার অণুর হয় সৃষ্টি—যার ধর্ম হচ্ছে মাদকতা। সেরূপ জীবদেহে পরমাণু সমাবেশের ব্যতিক্রমে যে চিদ্‌ধর্মী অণুরও সৃষ্টি হতে পারে, এরূপ কথাও কোন কোন জীববিজ্ঞানীরা বলে থাকেন। কিন্তু তাঁরা এ অবধি এরূপে কোন জীবাণুর সৃষ্টি করতে পারেন নি। বলা বাহুল্য, অণুপরমাণুর গতির সঙ্গে আমাদের বিবিধ অনুভূতির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে যে সেই সম্বন্ধের মূলে রয়েছে একমাত্র রসায়নের এবং বল ও গতিবিজ্ঞানের নিয়ম—এ কথা আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করতে রাজি নয়। কয়েক প্রকার পরমাণুর সমাবেশে সংখ্যাতীত বিভিন্নধর্মী জড়াণুর সৃষ্টি ও তাদের নামগুণকীর্তন, কিংবা বুদ্ধিকৌশলে উদ্ভাবিত নানাবিধ যন্ত্রযোগে শক্তির উৎপাদন ও তার সাধনা বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য ও পরিণতি রূপে গণ্য করা যেতে পারে না। বিজ্ঞানীরা তাই শুধু মূর্তিপূজারী নয়। এই দৃশ্যমান বহির্জগতের মূলে বা তাকে অধিকার করে যে সদ্বস্তু রয়েছে, যাকে পারমার্থিক সত্য বলা যেতে পারে, তার অন্বেষণই হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। তারই স্বরূপ জানবার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে

বিজ্ঞানের সর্ববিধ প্রচেষ্টার মূলে। এ অন্বেষণ হয়ত কখনও শেষ হবে না, এ আকাঙ্ক্ষা হয়ত দুরাকাঙ্ক্ষা, এ লক্ষ্য হয়ত অনধিগম্য ; তথাপি এতেই বিজ্ঞানের প্রকাশ, উৎকর্ষ, গতি ও পরিণতি।

বিজ্ঞানের বিশ্ববর্ণনায় আমরা প্রাণ, মন ও চেতনার কোন স্থান দেখতে পাই না। বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে বিজ্ঞান যে ঐক্যের সন্ধান পেয়েছে তা হল এক সর্বব্যাপী তেজরশ্মির কম্পন। এর মধ্যে হয়ে গেছে জড় ও শক্তির একাকার। তেজরশ্মির এই চঞ্চলতার অন্তরালে প্রাণ-মনের যবনিকায় চেতনার শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, প্রশান্ত মহাজ্যোতির প্রকাশ যে ঢাকা পড়েনি এ কথা বিজ্ঞানীরা বলতে পারে না। কারণ তা আমাদের ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রানুভূতির সীমার পরপারে, বুদ্ধিবিচারের অতীতে এবং অনুমান-কল্পনার বাইরে। জড়, শক্তি, দেশ কাল সবই হয়ত এর মধ্যে পেয়েছে লয়। তাই আমাদের শাস্ত্রে একে বলেছে— অবাঙ্মনসোগোচরঃ।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
বিশ্বপরিচয়	১॥০
পঞ্চম সংস্করণ। নবম মুদ্রণ	
সুরেন ঠাকুর	
বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ	২।০
দ্বিতীয় মুদ্রণ	
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	
ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা	২।০
দ্বিতীয় সংস্করণ	
শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত	
পৃথ্বীপরিচয়	১।০
দ্বিতীয় সংস্করণ	
শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
প্রাণতত্ত্ব	১॥০
দ্বিতীয় সংস্করণ	
শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য	
আহার ও আহার্য	১।০
দ্বিতীয় সংস্করণ	
শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী	
বাংলা সাহিত্যের কথা	১।০
দ্বিতীয় সংস্করণ	
শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
বাংলা উপন্যাস	২৲
শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	
ভারত-দর্শনসার	৩।০
নবপ্রকাশিত	
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	
ব্যাধির পরাজয়	১॥০
নবপ্রকাশিত	